# ব্রহ্মবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ

প্রশ্নোত্তরে )

'পরলোক', 'শোক কেন ভাই' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা—

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরি, বি-এ, বিটি

প্রণীত।

থিয়োসফিক্যাল্ পাব্লিসিং হাউস্, বেঙ্গল্।

৪।৩এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৩৪২

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীসন্তোষ কুমার রায় চৌধুরি

"কালীকিংকর হাউস",

বড়িশা, ২৪ পরগণা



শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মিত্র প্রেস, ৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# উৎসর্গ পত্র

কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর (প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে) যখন প্রতীচ্য জড়বাদের কুহকে পরলোক, পরকাল, এমন কি ঈশ্বরে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হারাইয়া ইহজীবনকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতেছিলাম, তৎকালে যিনি প্রথম পথ-প্রদর্শকরূপে আমাকে প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা (Theosophy) পাঠে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়া আমার নব-জীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল যাঁহার প্রাঞ্জল, সারগর্ভ ও মধুর উপদেশে এবং তদপেক্ষা যাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবনের আদর্শে অশেষ উপকার লাভ করিয়াছি, সেই সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, সুধীশ্রেষ্ঠ, অক্লান্তকর্ম্মা, পরম শ্রদ্ধাস্পদ **শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস,** বেদান্তরত্ন মহাশয়ের শ্রীকরকমলে এই পুস্তিকা সাদরে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞগ্রন্থকার

# নিবেদন

বিগত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে "পন্থা", "গৃহস্থ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তাহাদেরই কয়েকটি একত্র করিয়া এই পুস্তিকা গঠিত হইল।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের অধিকাংশই আজকাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগৎকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন ; ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ বা পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ধ্যানপরায়ণ ঋষিগণ প্রত্যক্ষানুভূতি-দ্বারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়াছেন (ও করিতেছেন) তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। কিছু একটা শিখাইবার বা জ্ঞান দিবার শক্তি আমার নাই। এই পুস্তিকা খানি অনন্ত ব্রহ্মবিদ্যাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র সোপান বা অবতরণিকা। ইহা পাঠ করিয়া যদি এক ব্যক্তিরও অন্তরে সেই সাগরে অবতরণ ও অবগাহন করিবার বাসনা উদিত হয়, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

তারপর বক্তব্য এই যে আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ অবনী মোহন চট্টোপাধ্যায় ও সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত লালীমোহন মল্লিক মহাশয় বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধনাদি করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিক, তাঁহারা ঈদৃশ সাহায্য না করিলে মুদ্রাঙ্কন অসম্ভব হইত।

শেষ কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ একত্র করিয়া এই পুস্তক গঠিত হওয়ায়, ইহাতে স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। উদার পাঠক ইহা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বড়িশা, ২৪ পরগণা )
১লা বৈশাখ, ১৩৪২

শ্রীমাখন লাল শর্ম্মণঃ

# ভূমিকা

প্রাচীন গ্রীসে যাহাকে 'Theosophia' বলিত, উপনিষদে তাহার নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা'। Theos—ব্রহ্ম এবং Sophia—বিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যার আধুনিক নাম Theosophy—ইহাই বেদান্ত—বেদের, বিদ্যার, প্রজ্ঞার চরম। এই প্রজ্ঞা সনাতনী, চিরন্তনী—ইহাই 'The Ancient Wisdom'। ঋষিসঙ্ঘ ইহার ধারক, পালক ও রক্ষক—দেশে দেশে কালে কালে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় ঋষিরা সেই সনাতন ধর্ম্মে আংশিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন হিমালয়ের বিপুল জলধারাকে কোন এক খাত ধারণ করিতে সমর্থ নয়, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত এই প্রজ্ঞাধারাকে কোন এক ধর্ম্ম ধারণ করিতে সমর্থ নয়। এই জন্য বলা হয় সমস্ত ধর্ম্ম সেই অদ্বিতীয়া ব্রহ্মবিদ্যার ঐকদেশিক প্রকাশমাত্র—ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বধর্ম্মময়ী। গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন,—"প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য দুই হইতে পারে না।" অতএব 'নাস্তদস্তিবাদী' হওয়া—'আমার ধর্ম্মই ধর্ম্ম আর সমস্ত ধর্ম্ম—অপধর্ম্ম বা অধর্ম্ম' এরূপ মনে করা প্রগাঢ় মূঢ়তা।

ঋষিরা ঐ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যা "সর্ব্ব বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা।" অর্থাৎ উহা ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সার সমন্বয়। সেই জন্য এ যুগে যে ঋষিশিষ্যা (ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি) প্রায় ষাট্‌ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃ প্রচার করেন, তিনি বলিতেন 'Theosophy is the synthesis of religion, philosophy and science.'

ব্রহ্মবিদ্যা যদি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যার আলোকে জীবনের যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধানের সাহায্য হওয়া উচিত। ফলতঃও দেখা যায় কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কি সামাজিক কি রাষ্ট্রনৈতিক—প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নই থিওসফির আলোকে উদ্ভাসিত হইলে উজ্জ্বলিত ও বিশদিত হয়। সেই জন্য ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কি বলিতেন—Thiosophy is like a lamp in a dark place—ঘনান্ধকারেম্বিবদীপদর্শনম্। যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, পাঠক মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিলে এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিবেন।

গ্রন্থকার আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন,—"হিন্দু সমাজ এখন তাঁহাদের ঋষিসঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি হারাইয়াছে। থিওসফিই এই চাবি হাতে করিয়া আজ মর্ত্ত্যধামে উপস্থিত। অতএব, ভাই হিন্দু এই চাবি দিয়া তোমাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ কি অমূল্য রত্নই উহাতে নিহিত আছে। যেমন একই আকাশবারি সকল নদনদী, খালবিলই জলপূর্ণ করে, সকল ভূমিই উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা করে, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা (থিওসফি) সকল ধর্ম্মকেই সজীব ও আলোকিত করিতেছে ও করিবে।"

ব্রহ্মবিদ্যা অতি ব্যাপক ও বিরাট্ বস্তু। বৃহদায়তন কয়েকখণ্ড 'শব্দকল্পদ্রুম' রচনা করিলেও ইহার বক্তব্য নিঃশেষ করা যায় না। আমাদের গ্রন্থকার (শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী মহাশয়) সেইজন্য গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'ব্রহ্মবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ'। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার সকল কথা বলিবার প্রয়াস না করিলেও গ্রন্থকারকে (গুরুশিষ্যের সংবাদ ছলে) অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে

Dialogue Form এ গ্রন্থরচনার ইহাই সুবিধা। মহামনীষী Plato এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'—এই গুরুশিষ্য সংবাদ আকারে লিখিত। এইভাবে কথাচ্ছলে নানা বিষয়ের অবতারণা করা যায়। আমাদের গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন।

'জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এ দুয়ের মধ্যে কোনটি সোজা'? শিষ্য এই প্রশ্ন করিলে গুরু প্রথমতঃ তাহাকে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভেদ বুঝাইলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁহাকে ভক্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইল এবং সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ ইত্যাদির কথা তুলিতে হইল। ইহা হইতে ব্রহ্ম, প্রকৃতি পুরুষ, ভগবান্, ঈশ্বর, মায়া, জীব, জড়, দ্বৈতাদ্বৈত,—কত কথাই উঠিল। শত্রুরূপী ভগবান্ ও মিত্ররূপী ভগবান্ এবং জীবসেবাই যে ভগবৎ-সেবা আর ভগবানের বিরাট্ আত্মত্যাগের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়াই যে জীবের পরম পুরুষার্থ—গুরুকে এই সকল বিষয়ও তুলিতে হইল। তাহার পর পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, জীবের ক্রমোন্নতি এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বাহনে বিবর্ত্তন—এ সকল প্রসঙ্গেরও অবতারণা করিতে হইল এবং জীবের বিভূতি ও অষ্টসিদ্ধির কথাও বলিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি ও মন্ত্র. তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য, দশবিধ সংস্কার, খাদ্যাখাদ্য, যোগী ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি বহু বিষয়ের অল্পাধিক আলোচনা করিতে হইল। কৌতূহলী পাঠক গ্রন্থমধ্যে এই সকল বিষয় এবং গ্রন্থের পরিশিষ্ট তিনটি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন এই আমার বিশ্বাস।

মাখন বাবু ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ণাত—হিন্দুশাস্ত্রে ও থিওসফিক গ্রন্থে তাঁহার প্রগাঢ় প্রবেশ আছে। তিনি সুলেখক,—কঠোর ও কঠিন বিষয় বেশ সরল ও সরসভাবে বুঝাইতে পারেন। তাঁহার 'পরলোক'

'মার্গত্রয়' 'আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ যাহারা যত্নে পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা আমার এই উক্তিকে অত্যুক্তি মনে করিবেন না। আমার ধারণা 'ব্রহ্মবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ' পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক তথ্যের পরিচয় পাইবেন। সেই জন্য এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় ইহাই আমার কামনা।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

# সূচীপত্র

# ব্রহ্মবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ

জ্ঞান ও ভক্তি।

শিষ্য। জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে আপনার নিকট কিছু শুনিয়াছি। আজ ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে আমার ন্যায় নিম্নাধিকারীর উপযোগী যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিন। আচ্ছা, আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি সোজা ?

গুরু। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতির উপর উহা নির্ভর করে, কাহারো পক্ষে জ্ঞানমার্গ সোজা, কাহারো বা ভক্তিমার্গ সোজা। তবে, মোটামুটি, অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিমার্গই সহজ। ইহা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি কখনো জ্ঞান ভাল, কখনো ভক্তি ভাল এরূপ বলাতে অর্জ্জুনের মনে সংশয় আসিল,—এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। তাই দ্বাদশ অধ্যায়ের গোড়াতে তিনি ঐ প্রশ্নই করিয়াছেন। এতদুত্তরে ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গে বড় কষ্ট, ভক্তিমার্গে বড় মজা। কারণ, "আমি স্বয়ং আমার ভক্তকে সংসার-সাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করি।" ভক্ত শিরোমণি নারদও তাঁহার সূত্রে বলিয়াছেন "অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ"—অর্থাৎ অন্য পথ অপেক্ষা ভক্তিপথেই ভগবান্ সুলভ বা সহজলভ্য।

জীবন্ত বিশ্বাস।

শিষ্য। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমার ভক্তিপিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। অতএব কৃপা করিয়া ভক্তি কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা উহা লাভ করা যায় বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস, এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? তবে পূজ্যপাদ শাণ্ডিল্য, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই একটু আভাস দিতেছি শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমার মাতাঠাকুরাণী আছেন এবং তিনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, ইহা তুমি বিশ্বাস কর তো?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কারণ নিতাই তাঁহাকে দেখিতেছি এবং তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি।

গুরু। বেশ। তিনি দিনরাত কেবল তোমার চিন্তাতেই মগ্ন,—কিসে তুমি সুস্থ থাকিবে, কিসে তোমার ভাল হইবে, নিজের চিন্তা ভুলিয়া সর্ব্বদা উহাই ভাবেন, তোমার মলিন মুখ দেখিলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তুমি শত অপরাধ করিয়াও যদি তাঁর নিকট গিয়া কাতরকণ্ঠে একবার "মা" বলিয়া ডাক, তিনি আর থাকিতে পারেন না, সব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে কোলে তুলিয়া লন,—ইহাও বিশ্বাস কর তো?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে।

গুরু। ইহারই নাম জীবন্ত বিশ্বাস। আচ্ছা, ভগবানে এইরূপ বিশ্বাস আছে কি? এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন প্রভু আছেন যাঁহার অসীম স্নেহ, অপার করুণা, যিনি কীটাণুকীট হইতে মনু প্রজাপতি পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, তোমার গর্ভধারিণী অপেক্ষা কোটি গুণ স্নেহে নিয়ত পালন করিতেছেন, যিনি অসংখ্য প্রকারে নিয়ত তোমার কল্যাণ বিধান করিতেছেন, যিনি অতি

মহৎ হইলেও অতি তুচ্ছ জীবের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, যিনি কিছুই প্রতিদান চান না, কেবল অজস্র কৃপা-বিতরণেই তাঁহার আনন্দ, যিনি তোমাদিগকে এতই ভালবাসেন যে তাঁহার অপ্রাকৃত সুখরাজ্য ছাড়িয়া কতই ক্লেশ স্বীকার করতঃ মাঝে মাঝে নররূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং প্রতিপদক্ষেপে ক্ষুদ্র বালুকাকণা পর্য্যন্ত ধন্য ও পবিত্র করিয়া যান,—জিজ্ঞাসা করি এরূপ ভগবানে তোমার জীবন্ত বিশ্বাস আছে কি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। ভগবানে বিশ্বাস আছে বৈ কি।

গুরু। আমার প্রশ্নটি তুমি বোধ হয় বুঝিতে পার নাই। এই তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, আমাকে দেখিতেছ, কথা শুনিতেছ, মর্ম্মের কথা জানাইতেছ। প্রতি পলকে, প্রতি নিশ্বাসে, তোমার বিশ্বাস আছে যে আমি আছি, কথা শুনিতেছি এবং তোমার মনোবেদনা দূর করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহা যেরূপ বিশ্বাস কর, ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস ভগবানে আছে কি ? এক অনন্ত প্রেমময়, অসীম শক্তিময় পুরুষ নিয়ত তোমার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে বিরাজমান, তিনি তোমার প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন, প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন ; তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও প্রত্যেক জীব কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে, চক্ষুজল মুছাইতে তিনি আসিবেনই আসিবেন ; তাঁহার এমনি করুণা যে তাঁহাকে যিনি যে ভাবে দেখিতে চান তিনি সেই ভাবেই দেখা দেন,—তিনি জ্ঞানীর নিকট অনন্ত ব্রহ্মরূপে, যোগীর নিকট সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের নিকট দেহধারী মানবরূপে প্রকাশিত হন, ইহা ধ্রুব সত্য। যেমন বায়ু ঘরে বাহিরে আছে সেইরূপ তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রহিয়াছেন—এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস আছে কি ?

শিষ্য। এতক্ষণ পরে আপনার কথা বুঝিয়াছি।—আজ্ঞে না,

ওরূপ বিশ্বাস নাই। কিরূপে থাকিবে? আপনাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো তিলার্দ্ধ সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানকে তো প্রত্যক্ষ করি নাই, কাজেই জীবন্ত বিশ্বাস নাই।

গুরু। ঠিক বলিয়াছ। প্রত্যক্ষের দ্বারাই জীবন্ত বিশ্বাস আইসে। আবার এই জীবন্ত বিশ্বাস না আসিলে প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হয় না।

শিষ্য। তবে আমাদের ভক্তিলাভের কোন উপায় নাই?

গুরু। বৎস, হতাশ হইও না। ভগবানে বিশ্বাস আনিবার তিনটি উপায় আছে,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা বড়ই দুর্লভ ও বহু ভাগ্যের ফল। শাস্ত্রে আছে,

বিশ্বাস লাভের উপায়।

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

অর্থাৎ তাঁহাকে একবার দেখিলে একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়, সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না, প্রাক্তন কর্ম্মগুলি সব খসিয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানব এরূপ ভাগ্যবান নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে অনুমান ও আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইতে হয়। যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান, যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের অনুমান, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়া ভগবানের অনুমান অপরিহার্য্য। যোগবিদ্যা (occult science) বা জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব এই জগৎ যতই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবেন, ততই ইহার সৃষ্টি কৌশল, রচনা পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও পদার্থমাত্রের সার্থকতা (adaptability) দেখিয়া বিমোহিত হইবেন, ততই এক অনন্ত শক্তি, অসীম জ্ঞান ও অপার করুণার পরিচয় পাইতে

থাকিবেন। এইরূপে ক্রমশঃ সেই প্রেমময় পরম পুরুষের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আসিবে।

শিষ্য। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের অনুশীলনে আজকাল ঈশ্বরে বিশ্বাস না আসিয়া বরং ঠিক বিপরীতই ঘটিতেছে। ইহার কারণ কি ?

গুরু। উহা অল্প বিদ্যার ফল। এ সম্বন্ধে তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন কি বলিয়া গিয়াছেন স্মরণ আছে তো ? তিনি বলেন,—"অল্পবিদ্যা মানবকে নাস্তিকতা অভিমুখে লইয়া যায় বটে, কিন্তু গভীর জ্ঞান হইলে ভগবানে বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়া আইসে।" সে যাক্। এখন আপ্তবাক্যের বিষয় বলি শুন। যে সকল মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষগণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য। তাঁহারা বলেন, "আমরা ভগবানকে দেখিয়াছি, তিনি এইরূপ।" এই কথা শুনিয়া ভগবানের প্রতি অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহা কিরূপ, জান ? যে প্রদেশে তুমি যাইতে পারনা সেই স্থান হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসিয়া গল্প করেন, 'আমি এইরূপ অদ্ভুত বস্তু দেখিয়া আসিয়াছি" এবং যদি ঐ ব্যক্তির সামর্থ্য ও সত্যবাদিতার উপর তোমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে উক্ত গল্প খুব বিস্ময়জনক হইলেও যেমন তুমি বিশ্বাস কর, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

শিষ্য। বুঝিলাম যে অনুমান এবং আপ্তবাক্যের দ্বারাও ভগবানে বিশ্বাস আসিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি প্রত্যক্ষলব্ধ বিশ্বাসের ন্যায় জীবন্ত হয় ?

গুরু। তা হয় না বটে, কিন্তু তথাপি উহা এরূপ সুদৃঢ় হইতে পারে যে তদুপরি ভক্তিগৃহ অনায়াসে নির্ম্মাণ করা যায়।

শিষ্য। আপনার কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, বিশ্বাস ও ভক্তি দুইটি পৃথক্ জিনিষ। আমার ধারণা ছিল যে দুইই এক। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি বুঝাইয়া দিন।

বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভেদ।

গুরু। মনে কর তুমি কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিলে যে, এই গ্রামে একটি নূতন লোক আসিয়াছেন, অথবা তাঁহাকে একদিন পথে যাইতে স্বয়ং দেখিলে। ইহাতে ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল উহাই বিশ্বাস। অতঃপর তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলে যে তিনি বড়ই উদার, সরল, মিষ্টভাষী, বদান্য, সত্যবাদী ও দয়ালু। বিপুল ধনশালী হইয়াও অতি দীন ও দরিদ্রভাবে থাকেন এবং গভীর রাত্রে গ্রামস্থ প্রত্যেক দরিদ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলেন, "আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। যৎকিঞ্চিৎ আনিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। আপনারা সুখে থাকিলেই আমি সুখী হইব।" এই বলিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তথায় রাখিয়া যান। ইহা শুনিয়া তৎপ্রতি তোমার যে একটা ভালবাসা আইসে, তাঁহার পদপ্রান্তে তোমার হৃদয় যে লুটাইতে চায়, তাঁহার পদধূলি পাইলে তুমি যে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে কর,—সেই প্রেম, সেই ভালবাসাই ভক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়হীন জ্ঞান তাহাই বিশ্বাস এবং উহার গুণরাজি শ্রবণে তৎপ্রতি হৃদয়ের যে প্রবল আকর্ষণ তাহাই ভক্তি। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। তবেই বুঝিলে অগ্রে বিশ্বাস, পরে ভক্তি; বিশ্বাস ব্যতীত ভক্তি আসিতে পারে না। যদি কেহ বলিয়া যান এই স্থান খনন করিলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাইবে, তাহা হইলে সুবর্ণমুদ্রার গুণরাজি সম্যক্ জানিলেও যদি ঐ ব্যক্তির কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, তুমি কি

খননে প্রবৃত্ত হও? আকাশ কুসুমের মনোহারিণী বর্ণনা শুনিয়া কোন্ ব্যক্তির চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়?

শিষ্য। বিশ্বাস না আসিলে ভক্তি হয় না বুঝিলাম। কিন্তু বিশ্বাস আসিলেই কি সর্ব্বত্র ভক্তি আইসে? বিশ্বাস আছে অথচ ভক্তি নাই এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক মনে হয়। আপনি এইমাত্র যে ধনবান্ প্রেমিকের উল্লেখ করিলেন, তাঁহার পরদুঃখে অশ্রুমোচন ও নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখিয়া কয়জন ব্যক্তির হৃদয় গলিয়া যায়? গৌরাঙ্গদেব পরের দুঃখে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া পদপ্রান্তে লুটিয়াছিল? মহাপুরুষের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহাদের প্রেমভক্তি না আইসে তাহাদের উপায় কি?

গুরু। উপায় আছে। তাঁহাদিগকে ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কৃপালু মহাপুরুষগণ জীবহিতার্থে বাহ্যসাধন গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নিগূঢ় সাধন প্রণালী কেবল গুরুমুখগম্য। আমি এই বাহ্য সাধন গুলির কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। নারদ ভক্তি সূত্রে ভক্তিলাভের এই কয়টি উপায় কথিত হইয়াছে—(১) কুসঙ্গ ত্যাগ (২) স্ত্রী, ধনী, ও নাস্তিকের আলোচনা ত্যাগ, (৩) অভিমান ও দম্ভ ত্যাগ, (৪) শুষ্ক তর্ক ত্যাগ, (৫) কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, (কর্ম্মত্যাগ নহে) (৬) মহৎ কৃপা, (৭) নিরন্তর ভজন অর্থাৎ নিয়ত ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (৮) বিবিক্ত সেবা অর্থাৎ নির্জ্জনে বাস, (৯) বিষয় ত্যাগ, (১০) বিষয়াসক্তি ত্যাগ। শ্রীযুক্ত রামানুজ স্বামীও কয়েকটী উপায় বলিয়াছেন যথা,—(১) অখাদ্য ত্যাগ, (২) বিষয় চিন্তা ত্যাগ, (৩) ভগবৎ চিন্তা, (৪) জীবহিত, (৫) পবিত্রতা, সত্য, ক্ষমা ও দয়া, (৬) সাধুসঙ্গ, (৭) সৎগ্রন্থ পাঠ অর্থাৎ সাধু ও ভক্তদিগের চরিত্র শ্রবণ। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব চতুঃষষ্টি উপায়

ভক্তি লাভের উপায়।

দিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি ;—(১) গুরু-পদাশ্রয়, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) পরনিন্দা ত্যাগ, (৪) অন্য-দেব ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা ত্যাগ, (৫) গ্রাম্যবার্ত্তা ত্যাগ, (৬) ভক্তি বিরোধী গ্রন্থের অনুশীলন ত্যাগ, (৭) নাম গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (৮) স্তব, জপ ও পূজাদি, (৯) প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ না করা, (১০) ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক চেষ্টা ইত্যাদি।

শিষ্য। আপনি অনেকগুলি উপায় একবারে বলিয়া গেলেন, সুতরাং আমার কোনটিরই ভাল ধারণা হইল না। মাদৃশ ব্যক্তির কি কি করা কর্ত্তব্য তাহা একটু বুঝাইয়া বলুন।

কুসঙ্গ ও কুচিন্তা ত্যাগ।

গুরু। দেখ, প্রেম একটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু ; প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রেম আছে, থাকিতেই হইবে, কারণ স্বয়ং ভগবান প্রেম স্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। তবে এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সর্ব্বত্র বিকাশ কেন হয় না ইহাই বিবেচ্য। একখণ্ড হীরক যদি এইস্থানে থাকে এবং তাহার উপর ধূলি, মাটি, কুটা, পাতা পড়িয়া উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে উহার স্বাভাবিক জ্যোতির প্রকাশ হয় কি ? ইহাও ঠিক সেইরূপ। ক্রোধ, লোভ, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আবর্জ্জনা গুলো আমাদের প্রেম-হীরককে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোন রূপে এ গুলোকে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে পারিলেই প্রেমের জ্যোতিঃ বাহির হইবে। তাই প্রথমে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন, কাম ক্রোধ গুলো কোনরূপ ইন্ধন না পায়। এখন উক্ত মহাপুরুষগণের কথিত উপায় গুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ;—১ম নিষেধ-সূচক, ২য় বিধিসূচক। নিষেধ-সূচক গুলি প্রথমে অবলম্বনীয়, তৎপরে বিধি সূচক।

শিষ্য। আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দুই একটি উদাহরণ দিন।

গুরু। এই মনে কর যুবতী দেখিলে বা তাহার আলোচনা করিলে যদি কামের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে যদবধি না সকল রমণীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে পারিবে, তদবধি যুবতীকে দেখিবে না, বা তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ বা আলোচনা করিবে না। এইরূপ করিলে তোমার কাম প্রবৃত্তি ইন্ধন পাইবে না অর্থাৎ উদ্রেক হইবার অবসর পাইবে না। কিছুকাল এইরূপ অভ্যাস করিলে ঐ প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, অভিমানাদির পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম। এই জন্যই দেখ উক্ত মহা-পুরুষত্রয় কু-সঙ্গ ত্যাগ, পরনিন্দা ত্যাগ, স্ত্রী, ধনী ও নাস্তিকের সংসর্গ ও আলোচনা ত্যাগ এবং বিষয় ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। দুষ্ট ও বিষয়াসক্ত লোকের নিকট সর্ব্বদাই অশ্লীল কথা, পরনিন্দা, বা ধন, মান, ও ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনিতে পাইবে। এবং যতই উহা শুনিবে ততই তোমার মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, গর্ব্ব ও রাগ দ্বেষাদি জাগরিত হইতে থাকিবে, সুতরাং তোমার প্রেম-হীরকও ততই ঢাকা পড়িবে। এই জন্যই ভক্তি-কামীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কুসঙ্গ, কুচিন্তা ও কু-কথা ত্যাগের ব্যবস্থা।

শিষ্য। বুঝিলাম বটে, কিন্তু মানুষ সব ত্যাগ করিয়া কিরূপে থাকিবে? একটা অবলম্বন তো চাই।

গুরু। হাঁ ঠিক বলিয়াছ। মন কখনো শূন্য থাকিতে পারে না। একটি বস্তুকে তাড়াইলেই তাহার স্থানে আর কোন বস্তুকে বসাইতে হয়। এই জন্যই বিধিসূচক উপদেশের ব্যবস্থা। মানুষ যদি কুসঙ্গ ছাড়ে, তবে কাহার সঙ্গ করিবে? একটি সঙ্গ তো চাই, কারণ সঙ্গ লিপ্সা তাহার স্বাভাবিক। এই হেতু বলিয়াছেন, সে সাধুসঙ্গ করিবে।

সাধু সঙ্গ।

শিষ্য। সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে? কিরূপ ব্যক্তিকে সাধু বলা যায়?

গুরু। যাঁহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, পরহিত রত, প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত; যাঁহারা বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া তৎস্থানে ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারা জীবের গুণ ব্যতীত দোষ দেখিতে পান না, যাঁহাদের আত্ম পর ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই ভগবানের সন্তান বা ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি, এই জ্ঞানে যিনি জগতের সেবায় জীবন অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার শত্রু নাই, সকলেই মিত্র, যিনি সুখদুঃখ যাহা পান, ভগবানের দান বলিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট হন, যাঁহারা অপর কর্ত্তৃক প্রহৃত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও স্নেহ ভরে তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা করেন, ( যেমন নিতাই মাধাইকে, রামানুজ পুরোহিতকে ) তাঁহারাই সাধু।

শিষ্য। আপনি যে সকল গুণের উল্লেখ করিলেন, একাধারে উহা নিতান্ত দুর্লভ। বাস্তবিক ওরূপ মানুষ তো দেখা যায় না।

গুরু। এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন সাধুসঙ্গ বড়ই দুর্লভ এবং বহুভাগ্যের ফল। কিন্তু বৎস, সকল গুণ গুলি পূর্ণমাত্রায় না থাকিলেও, যাঁহাতে ইহার কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে আছে তিনিও সাধু।

শিষ্য। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও যদি না পাওয়া যায়, তখন উপায় কি? কাহার সঙ্গ করিব।

গুরু। সৎ গ্রন্থের সহবাস করিবে। সাধু ও মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিবে। ইহাতেও সাধুসঙ্গের আংশিক ফললাভ হইবে।

সৎ গ্রন্থ।

শিষ্য। আপনি কৃপা করিয়া যদি কতকগুলি মহাপুরুষের নাম করেন, আমি তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করি।

গুরু। কত নাম করিব, আপাততঃ যে গুলি মনে হইতেছে বলি। ব্যাস, বাল্মীকি, শুকদেব, ভৃগু, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, নারদ, জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মার বৃত্তান্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাইবে। এতদ্ব্যতীত মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, জন, পল প্রভৃতি খ্রীষ্টান সাধু, বুদ্ধদেব, অশোক, রামানুজ, রামানন্দ, নানক, কবীর, গৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গ (যথা হরিদাস, পুণ্ডরীক, রূপ, সনাতন প্রভৃতি) এবং আধুনিক মহাপুরুষগণ যথা—কেশব সেন, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাম প্রসাদ, কমলা কান্ত, সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুর প্রভৃতির জীবন চরিত পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিবে। ভক্তমাল গ্রন্থে আরও অনেক সাধু মহাত্মার বিবরণ পাইবে।

শিষ্য। আমার মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন উহা নিবেদন করি।

গুরু। বৎস, আমার নিকট তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। তুমি সরল ভাবে অতি অসঙ্গত প্রশ্ন করিলেও আমি সানন্দে উত্তর দিব।

অপূর্ণ আদর্শ ও পূর্ণ আদর্শ।

শিষ্য। আপনি যে সকল ব্যক্তির নাম করিলেন ইঁহারা মহাপুরুষ হইলেও মানুষ ছিলেন সুতরাং অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট। এই সকল অপূর্ণ মানবকে আদর্শ না করিয়া পূর্ণ ভগবানকে আদর্শ করা ভাল নয় কি?

গুরু। যে বালক কখনও সমুদ্র বা পর্ব্বত দেখে নাই তাহাকে যদি বলা হয় "সমুদ্র একটা বিশ হাজার মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড জলাশয় যাহার চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে, আর হিমালয় পর্ব্বত (২৯০০০) উনত্রিশ হাজার ফিট উচ্চ এক প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবি" তাহা হইলে সে সমুদ্র বা পর্ব্বতের কোন ধারণাই করিতে পারে না। সমুদ্র বুঝাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে একটি পুষ্করিণী দেখাইতে হয়, তৎপরে কোন নদী,

তৎপরে( যদি পাওয়া যায় ) কোন হ্রদ দেখাইয়া বলিতে হয় "এই যে প্রকাণ্ড জলাশয় দেখিতেছ, সমুদ্র ইহা অপেক্ষা অনেক বড়।" এবং পর্ব্বতের উচ্চতা বুঝাইতে হইলে, তাহাকে কোন চারিতলা গৃহের ছাদে বা কলিকাতার মনুমেণ্টের উপর তুলিয়া বলিতে হয় "এইরূপ কুড়িটা মনুমেণ্ট উপর উপর বসাইলে যত উচ্চ, অনেক পর্ব্বত তত উচ্চ।" সেইরূপ "ভগবান নিরাকার চৈতন্য, তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্তপ্রেম" ইহা শুনিয়া ভগবানের কোন ধারণাই হয় না ; কারণ অসীমের ধারণা করা সীমা-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই মহাপুরুষদিগের আশ্রয় লইতে হয়, তাঁহাদের বিপুল শক্তি ও জগদ্ব্যাপী প্রেমের ধারণা প্রথমে করিতে হয়। তৎপরে ভাবিতে হয় "অহো, যে প্রেম রাজপুত্র বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাসী করিয়াছিল, যে করুণা ক্রুসে-বিদ্ধ যীশুকে ঘাতকদিগের কল্যাণের জন্য কাঁদাইয়াছিল, যে শক্তি দ্বারা গৌরাঙ্গদেব স্পর্শমাত্র কুষ্টীকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, সেই বিপুল প্রেম, অপার করুণা, অসামান্য শক্তি, শ্রীভগবানের কোটি অংশের এক অংশও নহে। যে শক্তির এক কণামাত্রের এতই প্রভাব, এতই জ্যোতিঃ, সেই পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ প্রেম, না জানি কতই গভীর, বিরাট, অনন্ত!" এইরূপে অপূর্ণ হইতে পূর্ণকে, সান্ত হইতে অনন্তকে ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়।

শিষ্য। বুঝিয়াছি। আপনি কৃপা না করিলে আমার এই সংশয় থাকিয়া যাইত। তাহা হইলে সাধু মহাপুরুষগণ প্রত্যেকেই ভগবানের এক একটি অংশ?

**সমস্তই ভগবানের অংশ।**

গুরু। কেবল সাধু মহাত্মাগণ কেন, জীবমাত্রই ভগবানের অংশ ( মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ )। তাই বা বলি কেন? এই সমস্ত বিশ্বই ভগবানের অংশ, প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত ভগবানের অংশ।

শ্রুতিতে আছে "তাঁহার এক পাদ (অংশ) এই বিশ্ব এবং তিন পাদ অমৃত।"

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ভগবান্‌, ভগবান্‌ ব্যতীত আর কিছুই নাই, ইহা কিরূপে ধারণা করিব?

গুরু। ধারণা করা বড়ই কঠিন। তবে দু'একটা উদাহরণ দ্বারা আমরা কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি। শাস্ত্র বলেন মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে উপাদান বাহির করিয়া নিজের শক্তিতে জাল রচনা করে, ভগবান সেইরূপ নিজের ভিতর হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ (matter and spirit) বাহির করিয়া এই বিশ্ব রচনা করেন। মনে কর যখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চৈতন্য, ভগবানে একীভূত বা মিলিত হইয়া আছে, তখন প্রলয়াবস্থা অর্থাৎ বিশ্বাদি কিছুই নাই, তিনিই একক। সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি এই প্রকৃতি ও পুরুষ প্রসব করেন। তখন প্রকৃতি দেহ বা উপাধি স্বরূপ হন এবং পুরুষ বা চৈতন্য আত্মা স্বরূপে ঐ উপাধিতে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর প্রকৃতি অসংখ্য অংশে ও অসংখ্য প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রভৃতি অসংখ্য উপাধি দান করে এবং পুরুষ এই অসংখ্য উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে অসংখ্য জীব ও অসংখ্য ভূত উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একটি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। আচ্ছা, তুমি তো বিজ্ঞান পড়িয়াছ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন মনে আছে তো? তাঁহারা বলেন, অনন্ত আকাশে (যেখানে পূর্ব্বে কিছুই পরিদৃশ্যমান ছিল না) দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড তেজোমণ্ডল আবির্ভূত হয়।

উৎপত্তি।

ইহার নাম নীহারিকা ( Nebula )। ইহা যে কি বস্তু ঠিক জানা যায় না, তবে তাঁহারা অনুমান করেন যে এক অসীম তেজোরাশি সৌরজগতের যাবতীয় উপাদান বা মূল ভূতগুলিকে, সূক্ষ্মাকারে, বাষ্পাকারে ধারণ করিয়া এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। কাল-সহকারে এই ঘূর্ণায়মান প্রকাণ্ড বাষ্পরাশি তাপ বিকিরণ করতঃ যেমন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, অমনি ইহা হইতে এক একটি অংশ বিচ্যুত হইয়া গ্রহরূপে পরিণত হয় এবং ইহা স্বয়ং সূর্য্যরূপে কেন্দ্র স্থানে অবস্থান করে। সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, জল, বায়ু, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এই নীহারিকা হইতে উৎপন্ন এবং প্রত্যেক পদার্থে নীহারিকার দুইটি অংশই বর্ত্তমান,-বাষ্পীয় অংশটি জড় আবরণরূপে এবং তেজ অংশটি উহার শক্তি বা প্রাণরূপে অবস্থিত।

শিষ্য। একটু চিন্তা করিয়া দেখি। যেমন চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি। প্রত্যেক পদার্থে দুইটি অংশই আছে। চিনির পরমাণু সমষ্টিই চিনির জড়াংশ, এবং উহার মিষ্টতা, শুভ্রতা কঠিনতাদি উহার শক্তি অংশ। কেরোসিন তৈলের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং তরলতা, দাহ্যতা, তীব্রগন্ধ প্রভৃতি শক্তি-অংশ। বৃক্ষের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং বৃদ্ধিশীলতা, রসাকর্ষণ, ফলপুষ্প প্রসবপটুতা প্রভৃতি শক্তি-অংশ। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায় ?

গুরু। হাঁ ঐরূপই বটে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিও। আবরণের ( উপাধির ) তারতম্যানুসারে, শক্তি বিকাশের তারতম্য ঘটিতেছে। একই শক্তি বা তেজ জলরূপ উপাধিতে তরলতা, প্রস্তর উপাধিতে কঠিনতা, মধু উপাধিতে মিষ্টতা, মরিচ উপাধিতে কটুতা, নিম্ব উপাধিতে তিক্ততা, ইথার উপাধিতে আলোক তাপ ও তড়িৎ

এবং জীব-দেহরূপ উপাধিতে গমন পটুতা, পরিপাক শক্তি, রক্ত সঞ্চালন পটুতা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে।

শিষ্য। এই পর্যন্ত ঠিক বুঝিলাম ( ১ ) নীহারিকার জড়-অংশ ও শক্তি-অংশ ( matter and force ) হইতে সৌরজগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন ( ২ ) প্রত্যেক পদার্থে এই জড়াংশ ও শক্তি-অংশ আছে, ( ৩ ) বিভিন্ন উপাধিতে এই শক্তি বিভিন্নরূপে বিকাশ পাইয়াছে।

গুরু। আর একটি বিষয় বুঝিয়াছি—নীহারিকা আকাশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ যে বস্তু হইতে উহার আবির্ভাব তাহা অজ্ঞাত। বেশ। এখন মনে কর এই অজ্ঞাত বস্তুটির নাম ভগবান ( বা ব্রহ্ম ) ( স্বরূপে অবস্থিত ) এবং নীহারিকাটি তাঁহার প্রকট রূপ ( manifestation )। ইহার নাম ঈশ্বর ( Logos )। নীহারিকার জড়াংশের নাম প্রকৃতি এবং শক্ত্যংশের নাম চৈতন্য। আচ্ছা, এখন বল দেখি এই উপমা হইতে বিশ্ব রহস্য কি বুঝিলে।

শিষ্য। ( ১ ) অপ্রকট ভগবান হইতে যুগপৎ দুইটি বস্তুর আবির্ভাব হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ। ( ২ ) এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই ভগবানের বিরাট প্রকট রূপ বা ঈশ্বর। ( ৩ ) এই প্রকৃতি পুরুষ হইতেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন। ( ৪ ) প্রত্যেক পদার্থেই প্রকৃতির ও পুরুষের অংশ আছে। ( ৫ ) প্রকৃতি নানারূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি উৎপাদন করিয়াছে। ( ৬ ) পুরুষ বা চৈতন্য একরূপ হইলেও উপাধির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নরূপে প্রকাশ পান। *

* এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব "সত্যং শিবং সুন্দরং" নামক প্রবন্ধে একটু সবিস্তারে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিশিষ্ট ( ক ) দেখুন।—গ্রন্থকার।

গুরু। বেশ। তোমার উৎসাহ ও মনোনিবেশ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আচ্ছা, সমস্তই ভগবান, ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নাই ইহা এখন বুঝিলে কি?

শিষ্য। আজ্ঞে, এই বুঝিলাম যে জগতের প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক জীব প্রকৃতি পুরুষের অংশ, আর এই প্রকৃতি পুরুষ ভগবানের অংশ: অতএব প্রত্যেক পদার্থই ভগবানের অংশ। আচ্ছা, মানব ভগবানের অংশ, মহাপুরুষ ও ভগবানের অংশ; অথচ ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহার কারণ কি?

( জীবের মধ্যে ) প্রভেদ কেন?

গুরু। ইহার উত্তর তুমি নিজেই তো এখন দিতে পার। এইমাত্র বলিলে উপাধির বিভিন্নতা হেতু পুরুষ বা আত্মা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। দেখ, পুরুষ বা সচ্চিদানন্দময় আত্মা প্রত্যেক পদার্থে বিরাজিত, তিনি প্রস্তরে আছেন, বৃক্ষে আছেন, পশু পক্ষীতে আছেন, মানুষে আছেন, মহাপুরুষে আছেন; কিন্তু এই উপাধি বা আধার গুলি একরূপ নহে। প্রস্তর সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল আধার, এইজন্য ইহাতে আত্মার বিকাশ খুব কম। বৃক্ষাদি আধার তদপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া, আত্মা ইহাতে সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত। সেইরূপ বৃক্ষ অপেক্ষা পশু পক্ষী, পশু পক্ষী অপেক্ষা মানব এবং মানব অপেক্ষা মহাপুরুষের আধার অধিকতর সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ বলিয়া, আত্মাও ক্রমশঃ অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনও জীবেই ইহাঁর পূর্ণ বিকাশ নাই,—পূর্ণ বিকাশ একমাত্র ঈশ্বরে।

শিষ্য। দু'একটি উপমা দিয়া বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। দেখ, উপমার যেমন গুণ আছে, তেমনি দোষও আছে। ইহা দ্বারা মোটামুটি ধারণাটা অধিকতর স্পষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহার সকল অংশ প্রকৃত বিষয়ের সকল অংশের সহিত মিলে না। যাহা হউক, মনে কর আত্মা একটি মহা সমুদ্র। এই সচ্চিদানন্দ সাগরে যদি ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, তোলো, মালসা, জালা, শিশি, বোতল প্রভৃতি ডুবানো থাকে, তাহা হইলে যে বস্তুর যতটুকু আয়তন তাহা ততটুকুই জল ধারণ করিতে পারে। আবার মনে কর সূর্য্যের আলোকে তুমি খানিকটা গোময়, একখানি সাদা কাগজ, এক খানি থালা, এক খানি দর্পণ এবং এক খণ্ড হীরক পাশা পাশি রাখিলে। সূর্য্য তুল্যরূপে সকল বস্তুকেই আলোক দান করিতেছেন বটে, কিন্তু হীরক যতটা তেজ ধারণ করিবে, গোময় তাহা পারে কি? সেইরূপ আত্মা সর্ব্বজীবে বিরাজ করিলেও যাঁহার যেরূপ উপাধি তিনি সেইরূপ ধারণ করিতে পারেন।

ভগবান্ ও ঈশ্বর।

শিষ্য। আপনি 'ভগবান' ও 'ঈশ্বর' দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইই কি এক, না ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে?

গুরু। দুইই এক বটেন, কিন্তু অবস্থার কিছু প্রভেদ আছে। যখন তিনি স্বরূপাবস্থায় অসীম ও অপ্রকট থাকেন তখন তিনি 'ভগবান' (ব্রহ্ম) এবং সসীম ও প্রকট হইলে 'ঈশ্বর'। এই দুই অবস্থার কোনটিরই আমরা ধারণা করিতে পারি না, তবে একটা উদাহরণ দ্বারা ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। মনে কর কোন একটি বস্তু বা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তুমি উহাতে এরূপ তন্ময় ও একাগ্র হইয়া গিয়াছ যে তোমার বাহ্য জ্ঞান আদৌ নাই, তোমার চক্ষু কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ কিছুই শুনিতে পাইতেছে না মনও কিছুই চিন্তা

করিতেছে না, কেবল ঐ বস্তুটিতে তন্ময় হইয়া এক গভীর অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন আছে। তখন তোমার অবস্থা এরূপ যে হয়ত কত পিপীলিকা কামড়াইয়াছে, তুমি অনুভব কর নাই, কত লোকে উচ্চস্বরে ডাকিয়াছে তুমি শুনিতে পাও নাই, এক বিপুল আনন্দে ডুবিয়া আছ। ক্রমশঃ তোমার চৈতন্য হইল, তোমার মনে হইল—"আমি অমুক, আমার পিতা আছে, মাতা আছে, বন্ধু আছে", তোমার চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলে এবং স্মরণ হইল তোমাকে এই এই কার্য্য তখন করিতে হইবে। এই ভাবিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে। তোমার এই প্রথমাবস্থাটি কতকটা ভগবানের স্বরূপাবস্থার তুল্য এবং দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ্বরাবস্থার কতকটা অনুরূপ। স্বরূপাবস্থায় তিনি কেবল অসীম আনন্দে ডুবিয়া আছেন, ঈশ্বরাবস্থায় তিনি জাগ্রত হইয়া প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইতেছে "আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগৎ ও জীব সৃষ্টি ও পালন করা আমার কার্য্য"। ইহা কিরূপ জান? রাজা যখন অন্দরমহলে অন্তরঙ্গ-গণের সহিত বিহার করেন ও সেই আনন্দে ডুবিয়া থাকেন তখন তিনি ভগবান এবং যখন বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সিংহাসনে চড়িয়া প্রজাপালন কার্য্যে মন দেন তখন তিনি ঈশ্বর। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা আর দ্বারকা লীলা। বুঝিলে কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, কতকটা বুঝিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখি। যদি কোন সন্দেহ হয়, পরে জিজ্ঞাসা করিব।

গুরু। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। এই যে রাজার উদাহরণ দিলাম, উহা সর্ব্বাংশে ভগবানের সহিত মিলে না। রাজা যখন অন্তঃপুরে থাকেন, তৎকালে তিনি বহির্ব্বাটীতে থাকেন না, এবং যৎকালে বহির্ব্বাটীতে থাকেন তখন অন্তঃপুরে বিরাজ করেন না।

অর্থাৎ এককালে তিনি উভয় স্থানে বিরাজ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে এটি খাটে না। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে তিনি যুগপৎ অপ্রকট ও প্রকট থাকেন, এককালে দুই কার্য্যই করিতে পারেন। এটি স্মরণ রাখিও।

শিষ্য। তিনি ঈশ্বররূপে প্রকট হইয়া প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর সৃষ্টিকার্য্য কিরূপে সাধিত হইল সংক্ষেপে একটু আভাস দিন।

জীব সৃষ্টি।

গুরু। পুরাণাদিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবে। আমি দু'একটি মাত্র কথা বলিব। কুম্ভকার যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা স্তূপ দেখিয়া ঐ মৃত্তিকাকে প্রথমে গঠনোপযোগী করিয়া লন, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতিকে নিজ শক্তি দ্বারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন। ইহারই নাম ভূত সৃষ্টি বা ক্ষেত্র সৃষ্টি। অতঃপর তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া যথা স্থানে স্থাপিত করেন এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি সৃষ্টিকার্য্যের ভার দেন। ইহাই দেব সৃষ্টি। ইহার পর দেবগণ তাঁহার আদেশানুসারে অন্যান্য জীব সৃষ্টি করিতে থাকেন।

শিষ্য। তাহা হইলে, দেবগণও জীব সৃষ্টি করিতে সমর্থ?

গুরু। হাঁ। তাঁহারা কেবল উপাধি বা জড়াংশের সৃষ্টি করিতে পারেন, চিদংশ বা আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরই দান করেন।

শিষ্য। এই চিদংশটি কিরূপ?

গুরু। ইহা ভগবান বা ঈশ্বরের স্বরূপ; তবে ঈশ্বর বৃহৎ, এটি ক্ষুদ্র। মনে কর ঈশ্বর একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড এবং এক একটি চিদংশ এক একটি স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, চিদংশ একটি ক্ষুদ্র জলকণা। ঈশ্বর চিদানন্দ, জীব চিদংশ সচ্চিদানন্দের একটি পরমাণু। যেমন

একটি স্ফুলিঙ্গ যেরূপ আধারে স্থাপিত হয় তদনুরূপ শক্তি বিস্তার করে, একটি ক্ষুদ্র তৃণে ঈষৎ অগ্নি, কাষ্ঠে বৃহত্তর অগ্নি এবং সমগ্র অরণ্যে প্রচণ্ড দাবানল উৎপাদন করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে এই চিদংশ যাদৃশ উপাধিতে বাস করেন, চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দময়ত্বও তাদৃশ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। একথা সূর্য্যের ও সমুদ্রের উপমা দিয়া পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। আপনার কৃপায় একটি নূতন আলোক আমার অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। এতদিন মনে করিতাম ঈশ্বর নিরাকার এবং একটি পৃথক্ রাজ্যে বাস করিয়া এই জগদাদি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আজ বুঝিলাম তিনি নিরাকার হইলেও সাকার, অরূপ হইয়াও বহুরূপী তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমান।

ভগবান বিশ্বরূপী।

গুরু। হাঁ বৎস। ভগবান্ স্বরূপতঃ কিদৃশ কেহই জানে না, জানিতে পারে না। কিন্তু এই সমগ্র বিশ্বই তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি; এবং অণু পরমাণু হইতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, জল, স্থল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার এক একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। তিনি এক ও অখণ্ডভাবে থাকিয়াও অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তিনিই সূর্য্যরূপে তাপালোক, চন্দ্ররূপে জ্যোৎস্না, পৃথিবীরূপে আশ্রয়, মেঘরূপে বৃষ্টি, বৃক্ষরূপে ফলচ্ছায়া, নদীরূপে বারি এবং পুষ্পরূপে সৌরভ দান করিতেছেন। তিনিই মিত্ররূপে আমাদের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তিনিই আবার শত্রুরূপে আমাদিগকে দৃঢ়, সহিষ্ণু ও বলবান্ করিয়া তুলিতেছেন। ঐ যে জননী অনাহারে অনিদ্রায় পীড়িত সন্তানকে বুকে রাখিয়া জীবনের সকল সুখ হাস্যমুখে বিসর্জ্জন করিতেছেন, সেই অপার্থিব স্নেহ ও করুণা কোথা হইতে আসিল জান কি? উহা সেই অনন্ত করুণার একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র। একটি পরমাণু। যে নিউটনের ধীশক্তি, নেপোলিয়নের সমর-পটুতা, প্লেটোর জ্ঞান, রাফেলের চিত্র বিদ্যা, সেক্ষপীয়রের প্রতিভা,

জগৎকে বিমোহিত করিয়াছিল, উহা সেই অনন্ত শক্তির ছায়া মাত্র। চন্দ্রমা শোভিত নীল আকাশ, উত্তালতরঙ্গযুক্ত বিশাল বারিধি, অভ্রভেদী গিরিরাজি, শ্যামল শস্যপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর, ফলপুষ্পনিষেবিত কলকণ্ঠ-বিহঙ্গম-ঝঙ্কৃত বিচিত্র বনভূমি প্রভৃতি জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদায়ই সেই পরম সুন্দরের একটি মাত্র কটাক্ষ।

শিষ্য। জগতের সমস্তই ভগবান্—ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি, ইহা কি সকল দেশে সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য, সকল দেশেই সত্য। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সত্যটি পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু খুব উচ্চ অধিকারী ভিন্ন সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেন না; নিম্নাধিকারীকে নিগূঢ় রহস্য বলা এবং শূকরের গলায় মুক্তামালা দেওয়া তুল্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে (সম্ভবতঃ উচ্চাধিকারীর সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া) ঋষিগণ এই সত্যটি যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, জগতের কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। ইহা প্রথমে বেদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বজ্রগম্ভীর মন্ত্রে নির্ঘোষিত হয়। অতঃপর হিন্দুর দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কাব্যে, পুরাণে ইতিহাসে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারাই হিন্দুর জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা, রাজনীতি, সমাজনীতি এমন কি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত। "সব ব্রহ্ম" এই ভাবটি হিন্দুর এরূপ অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, আজকাল কবি গান গাহিয়া বলেন,—

"যে দিন তোমার জগৎ নিরখি,
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়ন পাত।"

এবং ভক্ত স্তব পাঠ করেন,—

"প্রফুল্ল-পদ্মেষু সরোবরেষু
তারা-বিচিত্রেষু নভস্থলেষু।
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্থ চিত্তে
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্॥"

শিষ্য। আপনি যে জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনার কথা উল্লেখ করিলেন, উহার প্রয়োজন কি? সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিলে তো শোক তাপ কিছুই থাকে না। ইহা কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব নহে?

ব্রহ্মজ্ঞানী।

গুরু। হাঁ বৎস। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন, বহু সাধনার ফল, ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ। ইহারই নাম ব্রহ্ম-সদ্ভাব বা ব্রহ্মজ্ঞান। জপ, তপ, পূজা, হোম, যোগ, যাগ প্রভৃতি যাবতীয় সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্যই এই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান কথার কথা নহে; জ্ঞানের ও ভক্তির চরম অবস্থাতে উপনীত না হইলে ইহা লাভ করা যায় না। যাঁহার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, গমনে, উপবেশনে, আহারে, বিহারে, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, "সমস্তই ভগবান্" এই বিশ্বাস, এই জ্ঞান অটুট ও অক্ষুন্ন থাকে, তাঁহারই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। এরূপ হইলে, তাঁহার নিকট দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতীত আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না, সুতরাং ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সুন্দর কুৎসিত, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ ইত্যাদি দ্বন্দ্বজ্ঞান তাঁহার একেবারেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাঁহার নিকট সমস্তই ভাল, সমস্তই সুন্দর, সমস্তই পবিত্র, কারণ ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাঁহার নিকট চন্দন বিষ্ঠা সমান, শত্রু মিত্র সমান, স্তুতি নিন্দা সমান, শীত গ্রীষ্ম সমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান, পাপ পুণ্য সমান।

তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, নাম রূপের ভেদ নাই, কারণ সকল বস্তুই এক,—ব্রহ্ম। তাঁহার আত্ম পর নাই ; স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তাঁহার পরম আত্মীয়, বড়ই আদরের ধন, তাহাদের জন্য তিনি দেহপাত করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ; কারণ, যে ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু, তাহারাই সেই ভগবান্, ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী অগ্নিতে দগ্ধ হন না, অস্ত্রে ছিন্ন হন না, জলে মগ্ন হন না, পাষাণে চূর্ণ হন না, কারণ তাঁহার নিকট অগ্নি, অস্ত্র, জল বা পাষাণ নাই, সবই তাঁহার "প্রিয়তমের" মূর্ত্তি।

শিষ্য। আপনি যে বর্ণনা দিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়।

গুরু। ভাল, প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ তো ? একটু মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখ প্রহ্লাদ কি বস্তু ছিলেন। বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রাজনীতি শিখিতে প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু রাজনীতি পড়িতে পড়িতে প্রাক্তন সাধনা বলে এবং ভগবৎ কৃপায় বালক প্রহ্লাদের ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইল। সুতরাং তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি শিখিয়াছ তাহার সারাংশ কিছু বল"। প্রহ্লাদ বলিলেন, "যিনি অনাদি, অনন্ত, অক্ষয় ও সর্ব্ব কারণের কারণ, সেই বিষ্ণুকেই নমস্কার করি"। ইহাতেই দৈত্যরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া "রে দুর্ম্মতে ! তোর বিষ্ণু আবার কে ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, বালক স্থির ধীর ভাবে উত্তর করিলেন,—

প্রহ্লাদ চরিত্র।

"যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ।"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই বিশ্ব এবং যিনিই এই বিশ্ব তিনিই বিষ্ণু। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই তিনি; অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই প্রহ্লাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাস পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে আরও কত সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে শুন,—

"দেবাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥"

ইহার অর্থ বুঝিলে তো? পশু পক্ষী মানবাদি সমস্তই অনন্ত বিষ্ণুর এক একটি রূপ বা মূর্ত্তি, কিন্তু ইহাদিগকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, (অর্থাৎ বস্তুতঃ ইহারা পৃথক্ নহে)। যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থকেই আত্মবৎ দর্শন করিবেন, কারণ এক বিষ্ণুই বিশ্বের যাবতীয় রূপ ধারণ করিয়া আছেন।

শিষ্য। কিন্তু ইহা যদি প্রহ্লাদের কেবল মুখের কথাই হয়? প্রতি-কার্য্যে, প্রতি চিন্তায়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যে এই অটুট ছিল, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। সেই প্রমাণই দিতেছি শ্রবণ কর। অতঃপর প্রহ্লাদ কিছুতে বিষ্ণুনাম ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঘাতকগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ বলিলেন,—

"বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামন্ত্বায়ুধানি মে॥"

"তোমাদের অস্ত্রে বিষ্ণু, আমাতেও বিষ্ণু। ইহা সত্য। অতএব অস্ত্রের দ্বারা আমার কোন হানি হইবে না।" বাস্তবিকই প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। অতঃপর হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নানা উপায়ে মারিতে চেষ্টা করেন ; অগ্নি, অভিচার, মত্ত হস্তী, পাষাণ প্রভৃতি সমস্তই একে একে ব্যর্থ হইল। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য কর। প্রথম—প্রহ্লাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় ও অটল দেখ। "অগ্নি আমার প্রিয়তম বিষ্ণুর একটি মূর্ত্তি, অস্ত্র আর একটি মূর্ত্তি, মত্ত হস্তী দয়াল হরির তৃতীয় মূর্ত্তি। অতএব ইহাদের দ্বারা কখনই আমার অনিষ্ট হইবে না, হইতে পারে না।" এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় নাই, সংশয় নাই। তাঁহার শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্র, বা আত্ম পর ভেদ জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সবই তাঁহার মিত্র, সবই আপনার ; কারণ সবই বিষ্ণু। যখন তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইল, তিনি বলিলেন,—"পিতঃ আমার অঙ্গ দগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, বোধ হইতেছে, যেন আমি পদ্ম পত্রে শয়ন করিয়া আছি।"

শিষ্য। তাঁহার শীতোষ্ণ সমজ্ঞান ছিল বুঝিলাম। কিন্তু শত্রু-মিত্র বা আত্ম-পর ভেদ ছিল না, তাহার প্রমাণ কি ?

গুরু। বৎস, বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রটি ভাল করিয়া পাঠ করিও। সকল প্রমাণই পাইবে। আচ্ছা, আমি দু'একটি প্রমাণ দিতেছি। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ বলিলেন,—"তুমি রাজার ছেলে। রাজা হইয়া শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ? মিত্রের সহিতই বা কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য সংক্ষেপে বল।" প্রহ্লাদ বলিলেন,—"গুরু আমাকে সামদানাদি সব শিখাইয়াছেন বটে, কিন্তু পিতঃ, সাধ্যাভাবে সাধনের প্রয়োজন কি ? যখন মিত্রামিত্র কিছুই নাই, তখন ঐ উপায় গুলির কি আবশ্যক ?

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥

আপনাতে, আমাতে,—সর্ব্বত্রই তো বিষ্ণু দেখিতেছি। অতএব শত্রু মিত্র পৃথক্ কোথায়?" কুপিত রাজা পুরোহিতগণকে বলিলেন—"অন্য উপায়ে ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলাম না। আপনারা মারণ মন্ত্র দ্বারা ইহার বধ-সাধন করুন।" পুরোহিতগণ মন্ত্রবলে ভীষণ কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। এই সকল কৃত্যা ( পিশাচাদিবৎ প্রচণ্ড মারক শক্তি ) প্রহ্লাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া পুরোহিত দিগেরই প্রাণ-সংহার করিতে লাগিল। কৃপাবতার প্রহ্লাদ আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি কাঁদিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"প্রভো! যদি আমি জীবনে কাহাকেও হিংসা না করিয়া থাকি, যদি আমি প্রাণিমাত্রকে আত্মতুল্য ভাল বাসিয়া থাকি, যদি আমার শত্রু-মিত্র জ্ঞান না থাকে তবে সেই পুণ্যবলে, হে করুণাময়, এই পুরোহিতগণকে জীবন দান করুন। ইহাদের দুঃখে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। আমি যত কিছু পুণ্য করিয়াছি সব লইয়া ইহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন এই প্রার্থনা।" ইহা বলিবামাত্র পুরোহিতগণ পুনর্জীবিত হইলেন।

শিষ্য। ধন্য প্রহ্লাদ! ধন্য ক্ষমা, ধন্য প্রেম!! ধন্য তোমার সর্ব্বভূতে বিষ্ণুদর্শন!!! আর বলিতে হইবে না; বুঝিয়াছি প্রহ্লাদ একটি সামান্য মানব ছিলেন না। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রহ্লাদের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইল না, অস্ত্রে ছিন্ন হইল না। ইহা কিরূপে বুঝিব? ভগবান্ যে সকল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়ম ( Physical and chemical laws ) স্থাপন করিয়াছেন, ভক্তের অনুরোধে তাহা ভঙ্গ করেন না কি?

গুরু। ভগবানের রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ নাই, সমস্তই নিয়মাধীন। অগ্নিতে দেহ দগ্ধ হওয়া যেরূপ প্রকৃতির নিয়ম, দেহ দগ্ধ না হওয়াও প্রকৃতির আর এক নিয়ম। প্রথম নিয়মটি সকলে জানেন, দ্বিতীয়টি সকলে জানেন না, এইমাত্র প্রভেদ।

প্রাকৃতিক নিয়ম।

শিষ্য। আপনার কথা কিছুই বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝিবে কিরূপে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়িয়া তোমরা যে "সব জান্তা" হইয়াছ। দেখ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা মহৎ ভ্রম এই যে, অভিমান বশতঃ সে মনে করে, প্রকৃতির সকল নিয়মই সে অবগত হইয়াছে। প্রকৃতির যে সকল সূক্ষ্ম রাজ্য আছে তাহার নিয়ম জানা দূরে থাক্, তাহার অস্তিত্ব অবধি স্বীকার করে না। কেবল স্থূলতম রাজ্যের বহিরংশটি জানিয়া সে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে। অসভ্য মানব যৎকালে "বস্তুমাত্র ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়" ইহাই স্বভাবের একমাত্র নিয়ম বলিয়া জানিত, তৎকালে যদি স্পেন্সার সাহেব হঠাৎ একদিন তাহাদের মধ্যে গিয়া এক ব্যোমযানে চড়িয়া শূন্যমার্গে উঠিতেন, তাহা হইলে "স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ হইল" বলিয়া তাহারা হয়ত তোমার ন্যায় বিস্মিত হইত। কাচের বাক্সে কোন বস্তু থাকিলে আমরা উহা দেখিতে পাই, কারণ আলোক রেখা স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গতায়াত করিতে পারে ইহাই স্বভাবের নিয়ম। এখন যদি এক ব্যক্তি "রন্জেন্‌রের" সাহায্যে তোমার আবদ্ধ লৌহ সিন্দুকের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পায়, সে কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিল? না, তোমার অজ্ঞাত আর একটি নিয়মের সাহায্যেই ঐরূপ করিতে সমর্থ হইল? চিঠি পত্রাদির দ্বারাই বিদেশীয় বন্ধুর সহিত আলাপ করা যায়, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। ভাল, আজকাল আমেরিকায় যে শত শত ব্যক্তি কেবল ইচ্ছা

শক্তি দ্বারা স্বীয় মনোভাব দূরস্থ বন্ধুর চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, ইহাতে কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে ? না, একটি নূতন নিয়মের অস্তিত্বের প্রমণ পাওয়া যাইতেছে ?

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন যে প্রকৃতির এরূপ অনেক নিয়ম আছে, যাহা সাধারণ মানবের অজ্ঞাত ; এবং আমরা যাহাকে Miracle বা অতি-প্রাকৃত ঘটনা বলি, তাহা এই সকল নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। যতদিন নিয়মগুলি অজ্ঞাত থাকে, ততদিন মানব ঐরূপ ঘটনাকে Miracle বলে, কিন্তু নিয়মগুলি জানিতে পারিলে, আর তাহাকে Miracle বলে না,—তাহা প্রাকৃতিক ঘটনা রূপে গণ্য হয়। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়।

Miracle বা অতি প্রাকৃত ঘটনা।

গুরু। হাঁ, তাই বটে।

শিষ্য। কৃপা করিয়া একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়।

গুরু। এক ব্যক্তি যদি একখণ্ড তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করে, আমরা উহাকে miracle বলি ; কারণ, ঐ ধাতুগুলিকে আমরা এক একটি মূল পদার্থ ( Elements ) বলিয়া জানি। এখন মনে কর এক ব্যক্তি উহাদিগকে ইথারে পরিণত করিয়া দেখাইলেন যে উহারা যৌগিক পদার্থ। তিনি দেখাইলেন যে, ইথারের হয়ত ১০টি পরমাণু ( atoms ) মিলিত হইয়া যে অণু ( molecule ) উৎপাদিত হয়, উহাই স্বর্ণের একটি অণু এবং ৭টি পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন যে অণু তাহাই তাম্রের এক একটি অণু এবং তাম্রকে ইথারে পরিণত করিয়া পরমাণু গুলিকে দশটি দশটি করিয়া সংযোজিত করা যাইতে পারে। আমরা যে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির এই নিয়মটি বুঝিব এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিব,

সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাম্রকে স্বর্ণ করা আমাদের নিকট miracle থাকিবে না। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তুমি দেখিলে একব্যক্তি বিনাবলম্বনে শূন্যে উঠিতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই উহাকে miracle বলিবে। কিন্তু তিনি যদি বুঝাইয়া বলেন—"দেখ, ইহাতে অপ্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃত 'কছুই নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম বশে ইহা ঘটে। সকল বস্তুর উপর বায়ুর যেমন একটা চাপ আছে, তেমনি ইথারেরও খুব বেশী চাপ আছে। তোমাদের ব্যারোমিটার যন্ত্রে ভিতরকার বায়ু নিষ্কাসিত হইলে, পার্শ্বস্থ বায়ুর চাপে পারদ যেরূপ উপরে উঠে, আমার উপরকার ইথার কতকটা সরাইয়া ফেলিলেই আমার দেহও ঠিক সেইরূপে পার্শ্বস্থ ইথারের চাপে আকাশে উঠিতে থাকে।" ইহা বলিয়া দু'একটি পরীক্ষা দ্বারা তিনি যদি নিয়মটি তোমাকে বুঝাইয়া দেন, অথবা ইথার সরাইবার প্রণালী শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে তখন তুমি আর এটাকে miracle বলিবে কি?

শিষ্য। তাহা হইলে, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্ট সিদ্ধির কথা শাস্ত্রে দেখা যায় তাহা অসম্ভব নয়। সমস্তই প্রকৃতির নিয়মে ঘটিতে পারে এবং সে নিয়মগুলি হয়ত সাধারণের জানা নাই। আচ্ছা, অগ্নিতে দেহ দগ্ধ না হওয়া অথবা স্পর্শমাত্র কঠিন রোগ আরাম করা ইত্যাদি (যাহা প্রহ্লাদ, যীশুখৃষ্ট, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে শুনা যায়) বর্ত্তমান যুগে ঘটে কি?

গুরু। ঘটে বৈ কি। তুমি জগতের কয়টা সংবাদ রাখ? আর যে সকল যোগী ও মহাপুরুষের এই সব শক্তি আছে, তাঁহারা অতি প্রচ্ছন্নভাবেই থাকেন, সাধারণের নিকটে ঢাক বাজাইয়া বেড়ান্ না। সে যাহা হউক, মুনি ঋষি অপেক্ষা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় তোমাদের সমধিক আস্থা আছে বলিয়া তাঁহাদেরই দু'একটি পরীক্ষা

বলিতেছি শুন। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় মেস্‌মেরিজমের খুব ধুম পড়িয়াছে বোধ হয় জান। ডেলবিয়ফ্ ( Delbœuf ) একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং এই কার্য্যে বেশ দক্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটি স্ত্রীলোককে তন্দ্রাবিষ্ট ( mesmerised ) করিয়া বলিলেলন— "তোমার দুইটি বাহুই আমি অগ্নিতে দগ্ধ করিব। দক্ষিণ বাহু পুড়িবে না, বাম হাত পুড়িবে।" এই বলিয়া এক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ দ্বারা তাঁহার দুই হাত স্পর্শ করিলেন। স্ত্রীলোকটির বাম হাত পুড়িয়া ভয়ানক ফোস্কা ও ক্ষত হইল, ডাইন্ হাতে কিছুই হইল না। পরদিন তাঁহাকে আবার তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া ডেলবিয়ফ্ বলিলেন—"তোমার যন্ত্রণা থাকিবে না, আহত স্থান শুকাইয়া যাইবে।" কি আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্ত হইতে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল এবং ঘাও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া গেল। আর একদিন ডেলবিয়ফ্ দেখিলেন, এক বৃদ্ধ স্নায়ুশূলের বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছেন ; নানাবিধ ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। তিনি বৃদ্ধের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"আপনার যন্ত্রণা কখনই থাকিবে না, এই মুহূর্ত্ত হইতে উপশম হইবে।" যাহা বলিলেন তাহাই হইল। বৃদ্ধ জীবন পাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই গুলিতো বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের লিপিবদ্ধ ঘটনা! ডেলবিয়ফের একটি ইচ্ছায় যদি স্ত্রীলোকের অঙ্গ দগ্ধ না হয়, একটি কথায় যদি বৃদ্ধ কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ যোগিশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পক্ষে কি তাহা অসম্ভব? না ঈশ্বরাবিষ্ট যীশু বা গৌরাঙ্গ ঐরূপ করিতে অসমর্থ ?

শিষ্য। আপনার কৃপায় অনেকগুলি সংশয় দূর হইল। এখন পুনরায় মূল বিষয়ে উপস্থিত হওয়া যাক। যখন

চণ্ডী। সবই ভগবান্, তখন অবশ্য লোভি, কৃপণ, হিংস্র,

খল, কপট, লম্পট প্রভৃতি দুষ্ট-চরিত্র ব্যক্তির মধ্যেও তিনি বিরাজিত ?

গুরু। নিশ্চয়ই। কারণ তাহারা তো সৃষ্টি ছাড়া নহে। দেখ, এই ভাবটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যেরূপ সুললিত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ করি জগতের কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যদি চণ্ডী না পড়িয়া থাক, একবার পাঠ করিয়া দেখিও, প্রতি পত্রে—প্রতি ছত্রে চরম জ্ঞান, চরম ভক্তি ও চরম কবিত্বের পরিচয় পাইবে। চণ্ডীস্তব জগতে অতুলনীয়, তাই ইহা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য। যখন ব্রহ্মময়ীর স্তবের সহিত তোমার হৃদয় একতান হইয়া যাইবে, পড়িতে পড়িতে যখন অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে "যিনি হিংসারূপে প্রেমরূপে লোভরূপে ত্যাগরূপে, দয়ারূপে, নিষ্ঠুরতারূপে, ক্রোধরূপে, ক্ষমারূপে, লক্ষ্মীরূপে, অলক্ষ্মীরূপে, জ্ঞানরূপে, অজ্ঞানরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ", তখন তোমার জীবন ধন্য, সেই মুহূর্ত্তটি তোমার জীবনের একটি অমূল্য মুহূর্ত্ত; কারণ তৎকালে তোমার নিকট সুন্দর কুৎসিৎ, পবিত্র অপবিত্র, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, চোর সাধু, প্রিয় অপ্রিয়, কেহই থাকিবে না; তুমি ক্ষণেকের জন্য এক অপূর্ব্ব শান্তিতে ভাসিবে।

শিষ্য। এই ভাবটি যদি সমগ্র জীবনে অক্ষুণ্ণ, নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়া যায়, ( যেমন প্রহ্লাদের ছিল ), তাহাকেই তো আপনি ব্রহ্মসদ্ভাব বলিয়াছেন। সমগ্র জীবনে রাখা দূরে থাক্, আমরা এক মুহূর্ত্ত, এক সেকেণ্ডেও রাখিতে পারি কি না সন্দেহ। আমিত ধারণাই করিতে পারি না কিরূপে একটা দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রকৃতি পশুতুল্য মানুষেও ভগবান্‌কে দেখা যায়।

গুরু। ইহা বড়ই কঠিন, অনেক সাধনার ফল। অগ্রে যে সকল বস্তুতে তাঁহার অধিক বিকাশ, সেই সকলে তাঁহাকে দেখিতে হয়।

সূর্য্যের তেজ প্রস্তরেও আছে অগ্নিতেও আছে সত্য, কিন্তু এক অন্ধকে যদি ঐ অসীম তেজের একটু আভাস দিতে চাও, তাহার হস্তে এক খণ্ড প্রস্তর দিলে সে তেজের একটু ধারণা করিতে পারে কি?

শিষ্য। কোন্ কোন্ পদার্থে ভগবানের অধিক বিকাশ তাহা জানিব কিরূপে?

গুরু। গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবানকে ঠিক ঐরূপ প্রশ্নই করিয়া ছিলেন—"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।" ইহার উত্তরে ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পার কোন্ কোন্ পদার্থে তিনি সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে প্রত্যেক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, তেজস্বী বা বলবান্ সেইটিতেই তাঁহার অধিক বিকাশ বা অভিব্যক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে, আপনি বলিতেছেন সুন্দর কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুতে ভগবানকে দেখা বড়ই কঠিন বলিয়া আমরা প্রথমে কেবল সুন্দর ও ভাল বস্তু গুলিতেই তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিব, কারণ এই গুলিতেই তিনি সমধিক বিকশিত। আচ্ছা, মন্দ বস্তু গুলিতে তাঁহাকে দেখিতে হইলে কিরূপে দেখিতে হয়?

গুরু। যাহাকে আমরা ভাল বলি তাহা যেমন ভগবানের কৃপা, যাহাকে মন্দ বলি তাহাও তাঁহার প্রচ্ছন্ন কৃপা মাত্র। ভগবান্ দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা জীবের কল্যাণ-বিধান করিতেছেন। ইহাদিগকে আমরা আলোক অন্ধকার, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। একটি শিশু বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে। তুমি তাহাতে ফুঁ দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলে। ইহাতে তাহার

শত্রুরূপী ভগবান্।

যাতনার একটু উপশম হওয়াতে সে তোমাকে প্রিয় বা মিত্র ভাবিতে লাগিল। পরক্ষণে একটি ডাক্তার আসিয়া নির্দ্দয় ভাবে তাহার হাত পা চাপিয়া ফোড়াতে ছুরি বসাইলেন। শিশু ভাবিল, কোথা হইতে তাহার এক বিষম শত্রু আসিয়াছে। একটি গাছের গোড়ায় তুমি কিঞ্চিৎ সার মাটি ও জল দিলে, গাছ ভাবিবে "এটি আমার মিত্র"। আবার যখন এক প্রবল ঝড় আসিয়া ডাল পালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, গাছ নিশ্চয়ই ভাবে "এটি আমার শত্রু।" কিন্তু ঝড় ব্যতীত গাছ কি কখনও শক্ত সমর্থ হইয়া বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিত? আমাদের জীবনের যত কিছু অপ্রিয় ঘটনা, শোক দুঃখ, বিপদ্ আপদ,—সমস্তই আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছে, ছদ্মবেশে আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা বিতরণ করিতেছে। সক্রেটিস্ বলিতেন "জ্যান্থিপির ন্যায় মুখরা ও প্রগল্‌ভা পত্নী না পাইলে তিনি কদাপি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিতেন না।" বাস্তবিক যাহাদিগকে আমরা শত্রু বলি তাহারাই আমাদের পরম মিত্র। যেমন কঠিন মাটি না থাকিলে মানব হাঁটিতে শিখিত না, যেমন উকা দিয়া না ঘসিলে অস্ত্র তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ বিরুদ্ধ শক্তি ব্যতীত আমাদের অন্তর্নিহিত গুণরাজি ( latent capacities ) কদাপি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। আমরা শীতাতপে কাতর না হইলে বস্ত্রাদি বয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ শিখিতাম কি? সমুদ্র আমাদের গতায়াতের ব্যাঘাত উৎপাদন না করিলে, নৌকা জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতির সৃষ্টি হইত কি? দূরত্ব না থাকিলে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবির্ভূত হইত কি? রোগশোক, জরামৃত্যু না থাকিলে কি ষড় দর্শনের জন্ম হইত? না বুদ্ধদেব ধরায় অবতীর্ণ হইতেন? দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তের মূল আমাদের শত্রু। অতএব সম্পদ্ অপেক্ষা বিপদ্ ভাল, মিত্র অপেক্ষা

শত্রু ভাল, কারণ শত্রুরূপেই ভগবান্ আমাদিগকে পূর্ণ কৃপা দান করিতেছেন।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই ভাবে জগৎকে দেখা কি সম্ভব ?

গুরু। সম্ভব বৈ কি, তবে খুবই কঠিন। দেখ, পূর্ণ চন্দ্র, বসন্ত-বায়ু, ফুল্ল কুসুম, যমুনাতীর, সুস্বর মুরলী, সুন্দর নটবর শ্যামরূপ—এই সকলের মধ্যে ভগবানের প্রেম ও করুণা প্রত্যক্ষ করা বড় কঠিন নহে, কিন্তু অমানিশি, ঘোর অন্ধকার, ঝটিকা-বৃষ্টি, ভীষণ শ্মশান, ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ, পেচক ও শৃগালের বিকট চীৎকার এবং লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা রুধিরপায়িনীর গগনভেদী হুঙ্কার ও প্রচণ্ড তাণ্ডব—ইহার মধ্যে তাঁহার অনন্ত প্রেম, অপার করুণা দেখিতে পাওয়া বড়ই কঠিন, বড়ই দুর্লভ।

কৃষ্ণ ও কালী।

শিষ্য। আপনি কৃষ্ণ ও কালীর যেরূপ বর্ণনা দিলেন, তাহা হইতে বোধ হইতেছে যেন ইহাঁরা ভগবানের দুইটি ভাব ( aspects ) স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছেন, জগতের সুখ, সম্পদ, সৌন্দর্য্য, আলোকের দিক্‌টা যেন কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বারা এবং বিপদ্, দুঃখ, ভীষণতা ও অন্ধকারের দিকটা যেন কালীমূর্ত্তি দ্বারা সূচিত হইতেছে। ইহাই কি মূর্ত্তিদ্বয়ের রহস্য ?

গুরু। ইহা একটি রহস্য বটে, কিন্তু মূর্ত্তিদ্বয়ের আরও অনেক রহস্য আছে। যতই চিন্তা করিবে, ধ্যান করিবে, ততই রহস্য স্ফুরিত হইবে।

শিষ্য। সে যাক্। যাহারা মন্দ বস্তুতে ভগবানকে দেখিতে না পারিবে, তাহারা কি করিবে ?

গুরু। তাহারা মন্দ বস্তু গুলি ত্যাগ করিয়া কেবল ভাল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিবে। পাপী, দুষ্ট ও অসৎলোক সম্বন্ধে আলাপ

ও চিন্তা করিবেনা, সর্ব্বদা সাধু চর্চ্চা ও সাধু চিন্তা করিবে। অন্ধকারের দিকটা না দেখিয়া আলোকের দিক্‌টাই দেখিবে।

শিষ্য। ইহা কিরূপে সম্ভব? পদে পদে তো আমাদিগকে দুষ্ট লোকের সহিত মিশিতে হয়, তাহাদের বিষয় শুনিতে হয়। তখন উপায়?

গুরু। ইচ্ছা করিয়া তাহাদের চরিত্র শ্রবণ বা আলাপ করিবে না। কিন্তু যখন একান্ত শুনিতে হইবে, তখন ভাবিবে ভগবান্ ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, বিকাশ পান নাই, দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে আত্মজ্যোতি লুক্কায়িত রহিয়াছে। যখন সৎকর্ম্মের দ্বারা এই আবরণ বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইবে, তখন ঐ জ্যোতি বাহির হইবে। ইহা ভাবিলে তাহাদের প্রতি করুণার উদয় হইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, মন্দ বস্তুতে ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু ভাল বস্তুতে তাঁহাকে কি ভাবে দেখিব?

মিত্ররূপে ভগবান।

গুরু। কেন? গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের কথার উল্লেখ করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই তো দিয়াছি। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য, প্রেম, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও তেজ দেখিবে, ভাবিবে তৎসমস্তই শ্রীভগবানের এক কণা মাত্র। একটি সুন্দর ও কোমল পুষ্প দেখিলে সেই অনন্ত সুন্দরকে মনে পড়িবে। পক্ষী স্বীয় শিশুকে আহার দিতেছে, গাভী হাম্বারবে বৎসের দিকে ছুটিতেছে বা মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিবা মাত্র তাঁহার অনন্ত করুণার স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে। মানবের মিষ্ট কথায়, ভক্তের গানে, প্রেয়সীর হাস্তে, শিশুর আব্দারে, কুসুমের সৌরভে এবং

খাদ্যের মিষ্টতায় সেই পরম মধুরেরই আস্বাদ পাইবে। আমাদের প্রতিভাশালী ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ইহা কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন শুন,—

"জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস রাত।
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে স্মরিব জীবন-নাথ॥
বার বার তুমি আপনার হাতে স্বাদে, গন্ধে ও গানে।
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তর মাঝখানে॥
পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে স্মরিব জীবন- নাথ॥"

শিষ্য। ইহাও সামান্য কথা নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদায়েই সর্ব্বদা ( অশনে বসনে শয়নে স্বপনে জাগরণে ) ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন বোধ হইতেছে। চিত্তের তীব্র একাগ্রতা, ধ্যানের প্রগাঢ়তা অগ্রে লাভ না করিলে, ইহা কি সম্ভব ?

গুরু। ঠিক ধরিয়াছ। অগ্রে একটি বস্তু অবলম্বনে চিত্তের প্রগাঢ় একাগ্রতা না জন্মিলে, বহু বস্তুতে একই বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সুন্দর বস্তুমাত্রেই ভগবদ্দর্শন, তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন থাকে না। মুহূর্ত্তের জন্য ঐভাব আসিলেও উহা স্থায়ী হয় না, ছুটিয়া যায়, তখন ভাবুক দুঃখ করিয়া বলেন,—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?"

শিষ্য। মাঝে মাঝে দেখিলে আর কি হইল ? বরাবর দেখিবার উপায় কি ?

গুরু। প্রথমে একটি বস্তুতে বা বিষয়ে একাগ্রতা অভ্যাস করিতে

একাগ্রতা-সাধন। হয়। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে একাগ্রতা সাধনের প্রণালীও বিভিন্ন। যাঁহার যে বিষয়ে বা বস্তুতে চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বিষয়েই ধ্যান অভ্যাস করিতে পারেন। মনে কর তুমি গোলাপ ফুল ভালবাস। চক্ষু মুদিয়া মানস-চক্ষে একটি গোলাপ ফুল দেখিতে চেষ্টা কর, উহার প্রত্যেক পাতা, পাপ্‌ড়ি, বোঁটা, কেশর, পরাগ সমস্তই দেখা চাই, উহার কোমলতা অনুভব করিবে, সুগন্ধের আঘ্রাণ পাইবে। প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইবে, হয়ত এক সেকেণ্ড দুই সেকেণ্ডের অধিক উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু নিত্য নিয়মিত রূপে ঐরূপ করিতে করিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত অভ্যাস করিলে, দেখিবে ঐফুলটি তোমার ধ্যানে যেন বাস্তব হইয়াছে। তখন তুমি অনায়াসে দু'এক ঘণ্টা উহাকে মনোমধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে, মন অন্য দিকে যাইবে না, উহাতেই স্থির হইয়া থাকিবে। তখন বোধ হইবে যেন তোমার বাহ্যজ্ঞান ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, যেন চক্ষু সম্মুখের জিনিষ আর দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ চতুর্দ্দিকের নানা শব্দ শুনিতে পাইতেছে না। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে এবং কয়েক ঘণ্টা তোমার চিত্ত ঐ পুষ্পে সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে। ইহার পর যে যে অবস্থা ঘটে, তাহা উল্লেখ করিবার এখন প্রয়োজন নাই; তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এটি প্রথম সমাধি, ইহার পর আরও অনেকগুলি সমাধি আছে। প্রথম সমাধি দ্বারা তুমি ক্ষিতি তত্ত্বটি জয় করিলে মাত্র: কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিকে জয় না করিলে ভগবদ্দর্শন ঘটিবে না। অতএব ঠিক এইরূপে তোমাকে এক একটি সমাধি দ্বারা এক একটি অবশিষ্ট তত্ত্ব (অপ্, তেজ বায়ু প্রভৃতি) জয় করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনার শেষের কথাগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যদি সুবিধা হয়, সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন মূল বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য কর। অবশ্য গোলাপ ফুল আমি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। যে বিষয়ে মন সহজে বসে, সেই বিষয় লইয়াই অভ্যাস করিতে হয়। কেহ বা শিব, বিষ্ণু, গণেশাদির মূর্ত্তি, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা জ্যোতিঃ, কেহ বা বিন্দু, কেহ বা মন্ত্রধ্বনি, কেহ বা সত্য-দয়াদি-ভাব, এবং কেহ বা শরীর মধ্যস্থ কোন চক্র বা নাড়ী অবলম্বন করিয়া, ধ্যান অভ্যাস করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—মনকে স্ববশে আনা বা একাগ্রতা-সাধন। যেরূপেই হউক প্রকৃতিকে যখন জয় করিতে পারিবে, মনটা যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে, তখন তুমি উহাকে যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই রাখিতে পারিবে, তখন অহর্নিশ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিতে পারিবে, তখন আর "হারাই হারাই সদা ভয়" হইবে না। তখন যাহা কবি-কল্পনা তাহা তোমার জীবনে বাস্তব হইবে, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেই প্রেমময়, করুণাময়কে দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে নদ-নদী-সিন্ধুরূপে তিনিই মধুক্ষরণ করিতেছেন, সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ুরূপে তিনিই অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, অসংখ্য জীবরূপে তিনিই অসংখ্য কৃপা দান করিতেছেন, তখন অর্জ্জুনের ন্যায় বিস্ময় বিহ্বল ও ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিতে থাকিবে—

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥"

শিষ্য। মনটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিলেই কি এই

জ্ঞান ও প্রেম আপনিই উদিত হইবে? না, চেষ্টা করিয়া আনিতে হইবে?

গুরু। যাহা চিরকালই আছে তাহার জন্য আবার চেষ্টা কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্মা একটি স্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ। ইনি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম-স্বরূপ। ইনি সকলের অন্তরেই বিরাজিত, কিন্তু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির আবরণে আবৃত থাকায়, সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন না। মনটার চঞ্চলতাকে নাশ করিলেই ইহার জ্যোতিঃ স্বতই বাহির হয়। যতক্ষণ মনের ক্রিয়া, যতক্ষণ সঙ্কল্প বিকল্প, যুক্তি তর্ক, বিচার বিবেচনা, স্মৃতি কল্পনা, ততক্ষণ এই প্রেম ও জ্ঞান আবৃত—আচ্ছন্ন। কিন্তু যেমনি সব স্পন্দন গুলি থামিয়া যায়, যেমনি মনটি স্থির ভাব ধারণ করে, অমনি আত্মার আলোক প্রকাশিত হয়। কিরূপ জান? যেমন আন্দোলিত—তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হয় না,—ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু জলটি স্থির হইলেই উহা প্রকাশ পায়, ইহাও সেইরূপ।

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি। এখন একটি জিজ্ঞাস্য আছে। "অদ্বৈত" ও "দ্বৈত"—এই দুটি শব্দ প্রায় শুনিতে পাই। ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি?

অদ্বৈতভাব ও দ্বৈতভাব।

গুরু। "অদ্বৈত" শব্দের মৌলিক অর্থ অদ্বিতীয় বা এক এবং দ্বৈত শব্দের অর্থ দুই বা বহু। যিনি জগতের সর্ব্বত্রে ভগবান্ বা ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না তিনি অদ্বৈত ভাবী; এবং যিনি নানা পদার্থ দেখিতে পান ও তাহাদের পার্থক্য অনুভব ও আস্বাদ করেন তিনি দ্বৈত-ভাবাপন্ন। অদ্বৈতীর নিকট এই বৈচিত্র্যময় জগৎ নাই, উচ্চ নীচ, সুন্দর কুৎসিত, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, উল্লাস অবসাদ নাই, তিনি সর্ব্বত্র এক সচ্চিদানন্দ বস্তুটিকেই

প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং তাঁহার জীবনটি একরস,—নিস্তরঙ্গ জলধির ন্যায় শান্ত, স্থির, গম্ভীর; মেঘ-মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; তাহাতে আলোক ও ছায়ার খেলা নাই, রামধনুর বিচিত্রতা নাই। দ্বৈতভাবীর নিকট ভগবান্ বৃহৎ, বিরাট, ভূমা; জীব ক্ষুদ্র, অণু, অল্প; ভগবান্ স্রষ্টা, কর্ত্তা, পাতা; জীব সৃষ্ট, আশ্রিত; ভগবান্ প্রভু, পিতা, মাতা, সখা, বা কান্ত; জীব দাস, সন্তান, বা সখী। তাঁহার ভগবান্টি এরূপ রসিক, এরূপ প্রেমিক, এরূপ দয়ালু যে অতি বৃহৎ হইয়াও তিনি অতি তুচ্ছ জীবের জন্য সদাই ব্যাকুল ও সর্ব্বত্যাগী, "নিশিদিন তাঁর ঝরে অশ্রুজল"। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ—সবই তাঁর দান,—সবই তাঁর কৃপা। স্নেহময়ী মা কোলের ছেলেকে কখনো চুম্বন করিতেছেন, কখনো বা আদর ক'রে একটা চড় মারিতেছেন; প্রাণেশ্বর কখনো প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন, কখনো বা পরিহাসচ্ছলে একটু অন্তরালে যান। এইরূপে তাঁহার জীবনে নিয়ত উত্থান-পতন, আশা-ভয়, হর্ষ-বিষাদের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। জগতের সকল রসই তিনি আস্বাদ করেন, তারা, মুদারা, উদারা সকল সুরেই তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিতে থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এ দুয়ের মধ্যে সত্য কোন্টি? ইহারা তো পরস্পর বিরোধী ( Contrary ), সুতরাং দুইটিই কখনো সত্য হইতে পারে না।

গুরু। দেখ, একই বস্তুকে নানাভাবে দেখা যায়। মনে কর মৃত্তিকা। ইহা হইতে হাঁড়ি, শরা, মালসা, তোলো, কলসী, জালা প্রভৃতি নানা দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। একজন হয়ত এই সকল পৃথক্ বস্তুর দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া, কেবল ইহাদের উপাদানটিকেই দেখেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে হাঁড়ি শরা প্রভৃতি নাই, সবই মাটি।

আর এক জনের হয়ত এরূপে দেখিলে তৃপ্তি হয় না। তিনি প্রত্যেক বস্তুটির আকার, গঠন, সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা দেখিয়া, আনন্দ ভোগ করেন এবং ভাবেন, ইহারা সকলেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং মৃত্তিকা ইহাদের জননী, ইহারা সন্তান। কথাটা একই, কিন্তু দেখাটা স্বতন্ত্র ভাবে। আবার ধর ইথার। মনে কর পৃথিবী আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে কেবল অসীম ইথারই ছিল; এই ইথারের কিয়দংশ ঘনীভূত হইয়া, এই পৃথিবী এবং যাবতীয় পদার্থ (জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণ, লৌহাদি ধাতু, কীট, পশু, মানবাদির দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি) উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য তুমি জান যে ইথারটি এত সূক্ষ্ম যে ইহা ইট, কাঠ, পাথর, জল, বায়ু—সকল পদার্থের মধ্যেই পরিব্যপ্ত রহিয়াছে, বাস্তবিক এই পৃথিবী যেন একটা অনন্ত ইথার-সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে। যে অনন্ত ইথারের এক অংশ জমাট বাঁধিয়া এই পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে, সেই ইথারের ক্রোড়ে পৃথিবী শায়িত, সেই ইথার জননীর ন্যায় পৃথিবীকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এখন যদি কেবল ইথারটির দিকেই তোমার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, জল বায়ু, মৃত্তিকা প্রস্তর, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে মায়িক বা ক্ষণিক বলিয়া বোধ হইবে; ইহাদের রূপ-রস, গন্ধ-স্পর্শ বা শব্দ তোমার অনুভূতই হইবে না, সর্ব্বত্র এক ইথারেরই সত্তা উপলব্ধ হইবে। তোমার নিকট বিষ্ঠাও যেমন ইথার, চন্দনও তেমনি ইথার; বৃক্ষও ইথার, নিউটনের দেহও ইথার। আবার আর এক দিক্ হইতে দেখিয়া তুমি বলিতে পার "ইথার জননী-স্বরূপা। তিনি অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া, স্বীয় ক্রোড়ে তাহাদিগকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন। এই বস্তুগুলি সব একরূপ নহে, তাহাদের মধ্যে কেমন বৈচিত্র্য, কেমন সৌন্দর্য্য! ছোট বড়, অল্প উন্নত, অধিক উন্নত প্রভৃতি কত রকমেরই সন্তান মা'য়ের কোলে খেলিতেছে!" আচ্ছা, এখন

দেখা যাক্ ইহা হইতে আমরা কি বুঝিলাম। একটি মাত্র বস্তু আছেন। ইনিই অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম বা আত্মা এবং দ্বৈতবাদীর ভগবান্। ইনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক মাঝে মাঝে নিজের কিয়দংশ বিশ্বে পরিণত করিয়া, নিখিল ভূত ও জীবের প্রাণস্বরূপ হইয়া, তাহাদিগকে ধারণ ও পোষণ করেন। এই প্রকট অংশটির প্রতি অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য নাই। তিনি অপ্রকট, অব্যক্ত বস্তুটিকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করিয়া, প্রকট বিশ্বাদিকে মায়িক, অলীক বা ক্ষণিক বোধে উপেক্ষা করেন। দ্বৈতবাদী এই অপ্রকট বস্তুটিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন না। তিনি বলেন "ভগবানের অপ্রকট ভাবটি দুর্জ্ঞেয়। তিনি ঈশ্বর-রূপে প্রকটিত হইয়া, বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশ। অতঃপর তিনি জীবের হিতার্থে স্থূলদেহে মধ্যে মধ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। জীব যদি ভগবানের এই সকল প্রকট মূর্ত্তির ধ্যান-ধারণা ও পূজা করে তাহা হইলেই সে কৃতার্থ হইতে পারে।"

শিষ্য। বুঝিলাম যে একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখেন বলিয়া এক জন অদ্বৈতবাদী, আর একজন দ্বৈতবাদী। আচ্ছা ইহাঁদের সাধন-প্রণালীর পার্থক্য আছে কি?

গুরু। আছে বৈ কি। যখন দু'য়ের লক্ষ্য পৃথক্, উদ্দেশ্য বিভিন্ন, তখন সাধন-প্রণালী বিভিন্ন হইবেই হইবে।

শিষ্য। উদ্দেশ্য পৃথক্ কিসে? দুজনেই তো ভগবান্‌কে লাভ করিতে চান?

গুরু। অদ্বৈতবাদী ভগবান্‌কে পাইতে চান না। ভগবান্ হইতে চান। কারণ ভগবান্‌কে পাইলেও দুইটি বস্তু থাকেন—তিনি এবং ভগবান্ অর্থাৎ দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়।

শিষ্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। অদ্বৈতবাদী বলেন, "এক ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই, সমস্তই ব্রহ্ম, অতএব আমিও ব্রহ্ম—সোঽহং। তবে অজ্ঞান বশতঃ আমার দ্বৈতজ্ঞান হইতেছে। যতক্ষণ দ্বৈত-বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিব আমার অজ্ঞান ঘুচে নাই। যেমন অজ্ঞানটির নাশ হইবে, অমনি দ্বৈত-বুদ্ধিও দূর হইবে, অর্থাৎ আমি বুঝিব আমিই ব্রহ্ম,—আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই।" অতএব অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য ব্রহ্মে লীন হওয়া এবং দ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য ভগবানের রাজ্যে বা নিকটে থাকিয়া ভগবানের সেবা করা।

শিষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করেন?

গুরু। অদ্বৈতবাদী চিন্তা ও বিচারের আশ্রয়ে পরম বস্তুতে লীন হইতে চেষ্টা করেন। তিনি ভাবেন "আমি সচ্চিদানন্দ। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। অজ্ঞান বশতঃ যেমন কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-প্রভাবে আমার আমাতেই এই জগৎ-ভ্রম হইতেছে। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, চন্দ্র-সূর্য্য, বায়ু-অগ্নি, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি যাহা কিছু আমি দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি,—সমস্তই মিথ্যা, কল্পনা মাত্র। ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহারা স্বপ্ন। আমি আর স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হইতে চাই, স্বরূপাবস্থা পাইতে চাই।" এইরূপ চিন্তা, বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে, কোন না কোন জন্মে তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি পান অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদীর জীবন বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপে যদি নির্ব্বাণ-মুক্তি পাইতে হয়, আমার নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রয়োজন

নাই। ভগবান্ চারিদিকে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়াছেন, পত্র-পুষ্পে, গিরি-প্রস্রবণে, সিন্ধু-সরিতে, শশি-দিবাকরে, তারকাখচিত নীলাকাশে, মাতৃস্নেহে, সাধুচরিত্রে যে অসীম প্রেম ও করুণার পরিচয় দিতেছেন— এ গুলিকে সব মিথ্যা বলিতে হইবে? বলেন কি? যে প্রেম প্রতাপ সিংহকে গিরিগুহাবাসী করিয়াছিল, বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাসী করিয়া ছিল, গৌরাঙ্গকে জীবের দুঃখে, পথে পথে কাঁদাইয়াছিল, যে করুণা-প্রভাবে যবন হরিদাস (তাঁহার অঙ্গ বাইশ বাজারের প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেও) শত্রুদিগের জন্য ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

সেই প্রেম সেই করুণা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সত্য কি?

গুরু। বৎস, তোমার হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন প্রেমপথের পথিক হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক যাহার অন্তর প্রেম-প্রবণ, অদ্বৈতমার্গ তাহার নিকটে বড়ই নীরস ও শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। এখন বুঝিলাম জ্ঞান-মার্গ তোমার উপযোগী ও প্রীতি-প্রদ হইবে না।

শিষ্য। তবে দ্বৈতভাবে কিরূপে সাধনা করিব, কৃপা করিয়া, কিছু উপদেশ দিন।

গুরু। অদ্বৈতবাদী বলেন "আমিই ব্রহ্ম", কিন্তু দ্বৈতবাদী বলেন "আমি দাসানুদাস তিনি প্রভু, আমি সন্তান তিনি পিতা বা মাতা," অগ্রে ভগবানের সহিত এরূপ একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লও। দাস হও, কি ছেলে হও, কি সখা হও,—তাতে বড় কিছু আসে যায় না; তবে একটা কিছু হওয়া চাই। আমার বোধ হয় প্রথমে দাস কিম্বা সন্তান হওয়াই সহজ। তার পর যাহা করিতে হইবে তাহা নিজেই কতক

বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, তুমি কি করিলে তোমার মাতার অধিকতর স্নেহভাজন হইতে পার?

শিষ্য। কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিলে।

গুরু। বেশ বলিয়াছ। তাঁহার সেবা করিলেই তিনি তোমাকে অধিক ভাল বাসিবেন। ভাল, সেবা করিবে কিরূপে? তাঁহার পা টিপিয়া দিলে, গায়ে হাত বুলাইলে, পাখার বাতাস করিলে, বা তাঁহার জন্য ভাল খাদ্যদ্রব্য কি কাপড় চোপড় আনিয়া দিলে। এইরূপ সেবা করিলেই কি তিনি খুব প্রসন্না হন, না অন্য কোন প্রকার সেবা ভাল বাসেন?

শিষ্য। আপনার অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। আচ্ছা, বাবা, তোমার মা নিজে ভাল খাইতে পরিতে পাইলেই কি সুখবোধ করেন? তিনি কি নিজের জন্যই অধিকতর কাতর না অপরের জন্য সদাই চিন্তাকুল?

শিষ্য। ওঃ এইবার বুঝিয়াছি। তিনি আমাদের জন্যই সর্ব্বদা চিন্তিতা সন্দেহ নাই। তিনি নিজে খান্ আর নাই খান্ তা'তে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু সন্তানদের একটু কষ্ট দেখিলেই তাঁর চক্ষে জল আইসে।

গুরু। আচ্ছা বেশ। এখন বল দেখি কি করিলে তিনি তোমাকে খুব ভাল বাসিবেন? তাঁহাকে খাওয়াইলে? না তোমার ভাই-ভগিনী-গুলিকে খাওয়াইলে?

শিষ্য। ঠিক বলিয়াছেন। আপনার কথায় আমার বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন আমার ছোট ভাই কোথা হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। তাহার :হাতে সন্দেশ দেখিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মা তাহাকে বুঝাইয়া উহা হইতে একটু ভাঙ্গিয়া আমাকে দিলেন। আমার ভাগে কম হইল দেখিয়া, রাগে ও অভিমানে

আমি উহা দূরে নিক্ষেপ করিলাম এবং মাকে গালি দিয়া তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতে মা একটুও রাগ না করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে কোলে লইলেন ও বলিলেন "তোকে বাজার থেকে কিনে দিব।" ইহাতে আমার ক্রোধের শান্তি হইল না। আমি কোল থেকে নামিয়া ছোট ভাইটিকে আক্রমণ করিলাম। যেমন ভাইটি কাঁদিয়াছে, অমনি মা ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে লইলেন ও আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম মা'কে মারিলে পার আছে কিন্তু ভাইকে মারিলে রক্ষা নাই।

গুরু। এখন বুঝিলে কি কিসে তোমার মাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতা হন? তোমার জননীর পক্ষে যে নিয়ম, বিশ্ব-জননীর পক্ষেও ঠিক তাই। তোমাদের সুখে যেমন তোমার গর্ভধারিণীর সুখ এবং তোমাদের দুঃখেই তাঁহার দুঃখ, সেইরূপ অসংখ্য সন্তানের আনন্দেই জগন্মাতার আনন্দ।

জীব-সেবাই ভগবৎ-সেবা।

তোমার ভাই-ভগিনীগুলিকে ক্লেশ দিয়া তুমি ভাল খাদ্য বা বস্ত্রাদি দ্বারা মা'য়ের সেবা করিলে যেমন তিনি প্রসন্না হন না, ঠিক সেইরূপ যাঁহারা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে স্বর্ণ-প্রতিমা করিয়া খুব ধুমধামে দেবদেবীর পূজা করেন, অথচ সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত বিবস্ত্র ত্রিতাপ-তাপিত নরনারীর প্রতি একবার ফিরিয়াও তাকান না, তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা ব্যর্থ হয় জানিবে। অতএব কায়মনোবাক্যে জীব-সেবাই প্রকৃত ভগবৎ-সেবা। *

শিষ্য। ইহা তো বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কথা।

গুরু। কেবল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কেন, সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা এই। তবে বুদ্ধদেব এই ভাবটি, যেমন পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন, জগতে আর

* জীবসেবা কিরূপে করা যায়, "জীবের কল্যাণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। পরিশিষ্ট (খ) দেখুন।—গ্রন্থকার

কেহই সেরূপ করেন নাই। কেন, হিন্দু ধর্ম্মে বা খৃষ্টান্-ধর্ম্মে কি এ কথা নাই? হিন্দুর স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা—সর্ব্বত্রই এ কথা পাইবে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে। তন্ত্রে আছে,—

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং॥
অধীশেনাবৃতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ।
তৎপাতৄন পাতি বিশ্বেশঃ তস্মাৎ লোকহিতো ভবেৎ॥"

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "দেবি, ভগবান্ এই বিশ্বকে ধারণ ও আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব বিশ্বের হিতসাধন করিলেই ভগবান্ প্রীত হন। যাহারা বিশ্বের নাশেচ্ছু তাহারা নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং যাহারা জগতের মঙ্গল করে, ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব লোকের হিতসাধনই ধর্ম্ম।" আবার, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের নিত্যকার্য্যের মধ্যে যে পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা মন্বাদি-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সেই পঞ্চ যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি তাহা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখ নাই। ইহা ভগবানের মহা-যজ্ঞ বা বিরাট ত্যাগের একটি ক্ষুদ্র ছায়ামাত্র। প্রত্যেক জীবকে এই বিরাট ত্যাগের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর করানই ইহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। ভগবানের মহা-যজ্ঞ বা বিরাট ত্যাগটা কি?

গুরু। সে কথা পরে বলিব। এখন পঞ্চ যজ্ঞের কথা শুন। ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ—এই পাঁচটি যজ্ঞ গৃহস্থমাত্রের নিত্য-কর্ত্তব্য। যজ্ঞ শব্দের অর্থ আর কিছুই নয়, পরার্থে ত্যাগ। এখন দেখ, নিত্য তোমাকে কিরূপ ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে;—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।"

অর্থাৎ ঋষিগণের প্রীত্যর্থ তোমাকে রোজ বিদ্যাদান করিতে হইবে, পিতৃগণকে জলদান, দেবগণকে ঘৃতদান, পশুপক্ষীদিগকে খাদ্যদান এবং নরনারীকে অন্নদান করিতে হইবে। অর্থাৎ তোমার চতুঃপার্শ্বে যত জীব আছেন, তাহারা উচ্চই হউন আর নীচই হউন, সকলের জন্যই তোমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে। তর্পণের একটি মন্ত্র শুন,—

"যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

অর্থাৎ ইহ জন্মে বা অন্য জন্মে যাঁহারা আমার মিত্র ছিলেন বা শত্রু ছিলেন, সকলেই পরিতৃপ্ত হউন। ইহাতেও যেন হিন্দু তৃপ্ত না হইয়া, আবার ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন,—

"আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"

জগতের যে যেখানে আছেন সকলেই তৃপ্ত হউন, সকলেই তৃপ্ত হউন, তাঁহাদের আনন্দেই আমার আনন্দ।

শিষ্য। গীতাতে এই ত্যাগের কথা কিছু আছে কি?

গুরু। গীতার সর্ব্বত্রই এই ত্যাগের কথা। বাস্তবিক গীতাকে এই ত্যাগের গান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পঞ্চযজ্ঞের কথাই উল্লেখ করিয়া ভগবান্ কি বলিতেছেন শুন,—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।"

অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন, তিনিই পাপমুক্ত ও সাধু; কিন্তু যে কেবল নিজের জন্যই অন্ন পাক করে (অপর জীবকে দেয় না) সেই পাপিষ্ঠ পাপই ভক্ষণ করে। আবার সমগ্র গীতাতে ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "সর্ব্বদা কর্ম্ম কর, কদাপি কর্ম্ম ত্যাগ করিও না,

জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছেন। দেখ, আমার অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তথাপি আমি নিয়মিত কর্ম্ম করি; অতএব তোমরাও কর্ম্ম কর, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর, যাহা কিছু করিবে, আমাকে অর্পণ কর (তৎকুরুস্ব মদর্পণম্), আমার সহিত এক যোগে কর্ম্ম কর (যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি), সমস্তই আমার প্রীত্যর্থ কর ইত্যাদি।" আচ্ছা, ভগবান্ এই যে কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, সে কর্ম্মটা কি এবং তাহাতে সব কর্ম্ম অর্পণ করিবার অর্থ কি, কখন ভাবিয়াছ কি ?

শিষ্য। আজ্ঞে না, বিশেষ করিয়া চিন্তা করি নাই।

গুরু। অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জ্জুন "কর্ম্ম কি" এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন,—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

অর্থাৎ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যে ত্যাগ, সেই ত্যাগের নামই কর্ম্ম। ইহাই ভগবানের কর্ম্ম; এবং জীবের কর্ম্মও ঠিক এই আদর্শে গঠিত হওয়া চাই। ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্য। যে মহাযজ্ঞ বা বিরাট্ ত্যাগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম তাহা এখন বুঝিলে কি ? উহা এই কর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভগবান্ এই বিশ্বের সৃষ্টি, ধারণ ও পোষণ করিতেছেন তাহা কিরূপে বলিব ? যে হেতু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী উহার বিশালতা ও মহত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। তবে, দু'একটা লৌকিক উদাহরণ দিয়া ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করি।

ভগবানের বিরাট ত্যাগ।

আচ্ছা, তুমি তো একজন স্বাধীন ব্যক্তি, অনেক বিষয়েই তোমার স্বাধীনতা আছে। তুমি যাহা ইচ্ছা দেখিতে পার, যাহা ইচ্ছা চিন্তা

করিতে পার, মুক্ত বায়ুর ন্যায় যথা-ইচ্ছা বিচরণ করিতে পার। এখন মনে কর তুমি দেখিলে, এক নদীস্রোতে অসংখ্য পিপীলিকা ভাসিয়া যাইতেছে। তোমার দয়ার উদয় হইল, ইহাদিগকে রক্ষা করিবার বাসনা জন্মিল। তখন তুমি সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা, সকল স্বাধীনতা—আহার, বিহার, গল্প ভ্রমণ—সব ত্যাগ করিয়া এক গলা জলে দাঁড়াইয়া রহিলে এবং এক একটি পিপীলিকাকে উদ্ধার করিতে লাগিলে। আচ্ছা, কতক্ষণ এরূপে থাকিতে পার বল দেখি। স্মরণ রাখিও যে এক মুহূর্ত্তও অন্য-মনস্ক হইতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে শত শত পিপীলিকা মরিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। উহা বড়ই কষ্টকর বোধ হইবে। দশ পনর মিনিটেই হয়ত অধৈর্য্য আসিবে।

গুরু। আচ্ছা। আবার মনে কর রুসিয়ার সম্রাট্ একজন কত বড় স্বাধীন ক্ষমতাশালী, প্রতাপবান্ নরপতি ছিলেন। তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী, ধন রত্ন, গাড়ী ঘোড়া, বিভব ঐশ্বর্য্য, প্রভাব প্রতিপত্তি—কিছু অভাব নাই। এখন মনে কর তিনি এই সব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া অতি দীনবেশে একখানি জীর্ণ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া কুষ্ঠরোগীদিগের হাঁসপাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে, যদবধি না তিনি সকল রোগিগণকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন, তদবধি তিনি ঐ গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন, অন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না, অন্য কোন চিন্তা করিবেন না। এই রাজার দয়া ও ত্যাগ কিরূপ বল দেখি ?

শিষ্য। অসাধারণ! এরূপ তো কখনও শুনি নাই।

গুরু। তুমি যেমন সব সুখ ও সব স্বাধীনতা ছাড়িয়া এক গলা জলে দাঁড়াইয়া, পিপীলিকাগণের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হও, রাজা যেরূপ তাঁহার অতুল বিভবাদি ত্যাগ করিয়া হাস্যমুখে পূতিগন্ধময় অন্ধকারজনক হাঁসপাতালে আবদ্ধ হন, ভগবান্ সেইরূপ তাঁহার অনন্তমেয়, অননুভবনীয় নির্ব্বাণ সুখ—তুরীয় স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, জীবের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির জন্য অনন্তকাল আপনাকে এই ক্ষুদ্র বিশ্ব কারাগারে,—প্রকৃতি-নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বের—যাবতীয় ভূতের ও জীবের প্রাণ স্বরূপ হইয়া, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ইহাদিগকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প এই যে, যদবধি না তিনি অসংখ্য জীবকে ( অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীটকে পর্য্যন্ত ) ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত করিয়া সেই নির্ব্বাণ সুখের অধিকারী করিতে পারিবেন, সেই পরম ধামে লইয়া যাইতে পারিবেন, যতদিন না জাত ও অজাত জীবমাত্রকে নির্ব্বাণ মুক্তির মিষ্ট আস্বাদ দিতে পারিবেন, ততদিন তিনিও সেই আস্বাদ গ্রহণ করিবেন না, সর্ব্ব ত্যাগী সন্ন্যাসি রূপে এই বিশ্ব-শ্মশানে আবদ্ধ থাকিয়া, জীবের যাবতীয় বিষ ভক্ষণ করিতে থাকিবেন,—পিতা, মাতা, প্রভু বা সখা রূপে জীবের ক্লেশভাগী হইয়া সস্নেহে নয়নজল মুছাইবেন, ধীরে ধীরে তাহাকে মুক্তিপথে লইয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার ব্রত, ইহাই সঙ্কল্প। বৎস, এ দয়ার, এ ত্যাগের কি তুলনা আছে, না আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব ইহার ধারণা করিতে সক্ষম ?

শিষ্য। দেব, যাহা শুনিলাম তাহাতে রোমাঞ্চ হইতেছে। আমরা পুস্তকেই পড়ি "তাঁহার অনন্ত প্রেম"। ইহা কিরূপ এতদিন বুঝি নাই। আজ যেন ইহা একটু বুঝিলাম।

গুরু। বৎস, এখন ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ,—জীবের সৃষ্টি ও উন্নতির জন্য বিরাট ত্যাগ—বুঝিলে কি ? ইহাই ভগবানের "কর্ম্ম"।

এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও তিনি সদাই কর্ম্মরত।" এই কর্ম্মের জন্যই তিনি জীবকে আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, "আমি যেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসংখ্য সন্তানের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইয়াছি, জীবও আইস, যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি—এই কর্ম্মে আমার সহিত যোগ দাও, মৎকর্ম্মপরমো ভব—আমার কর্ম্মই কর, স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমার কর্ম্মের অনুকরণ কর, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, এই কর্ম্মের দ্বারাই জনকাদি সিদ্ধ হইয়াছেন।"

শিষ্য। জীব সেবা রূপ এই মহৎ ব্রত অবলম্বন করিতে চায় না, এরূপ পাষণ্ড কেহ আছে না কি?

গুরু। এই ব্রত যে কিরূপ কঠিন, কিরূপ দুরূহ তাহা তোমার আদৌ জ্ঞান নাই বলিয়া ওরূপ বলিতেছ। স্বর্লোকের, কি মহর্লোকের, কি জনলোকের সুখ যে কতই গভীর, কতই মনোহারী, কতই চিত্তাকর্ষক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং সাধনাবলে ও সৎকর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা ঐ সকল উচ্চতর লোকে স্থান পাইয়াছেন, জীব-সেবার জন্য তাঁহাদের ভূতলে নামিয়া আসা যে কিরূপ কষ্টকর, কিরূপ বিপুল ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন, তাহা তুমি আমি বুঝিব কিরূপে? মনে কর, যিনি ইন্দ্র বা মনু হইয়াছেন, তিনি যদি জীব হিতার্থে নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ভাব দেখি তাঁহাকে কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

শিষ্য। মহাপুরুষগণ আমাদের সেবার জন্য উচ্চতর লোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না কি?

গুরু। হন্ বৈকি। তবে, সকলে এরূপ কঠোর ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ হন না। এই পৃথিবীতে সাধনা দ্বারা যিনি যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করেন, পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহাকে তদনুরূপ উচ্চপদ প্রদান করেন, কেহ বা

আদিত্য, কেহ বসু, কেহ ইন্দ্র, কেহ মনু বা প্রজাপতির পদ প্রাপ্ত হন। অনেকেই এই সকল সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নীচে নামিতে পারেন না, যাবৎ পুণ্যক্ষয় না হয়, তাবৎ উচ্চলোকে থাকিয়া অপার আনন্দ ভোগ করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা এরূপ সুখ চান না, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা পায়ে ঠেলিয়া দেন। তাঁহারা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে ভগবান্‌কে বলেন, "প্রভো, বিশ্বপতে, রসিকবর, তুমি তোমার অনন্ত সুখের আলয় ত্যাগ করিয়া জীব হিতার্থ বিশ্বকারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছ; আর আমি নগণ্য কীটানুকীট, স্বচ্ছন্দে উচ্চলোকে বসিয়া সুখভোগ করিব? কৃপাময়, এ দাসের প্রতি এরূপ নিগ্রহ কেন? যদি কণামাত্র কৃপা থাকে, তবে দাসকে ঐ চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিও না, যেন জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, এ দাস ভূতলে আসিয়া জীবের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, যেন জীবের ক্রমোন্নতি কার্য্যে তিলমাত্রও সহায়তা করিয়া স্বীয় জীবন ধন্য করিতে পারে।"

শিষ্য। ধন্য প্রেম! ধন্য ভক্তি!! ধন্য ত্যাগ!!! এরূপ মহাপুরুষের চরণধূলি মাখিলেও দেহ পবিত্র হয়, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়।

গুরু। বৎস, এইরূপ প্রেমিকের চূড়ামণি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, ত্যাগীর অগ্রগণ্য কে, তাহা জান কি? পুরাণাদিতে যে মহাদেবের বর্ণনা আছে সে বস্তুটি কি, কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শ্মশানে মশানে থাকে, বাঘছাল পরে, কতকগুলো অস্পৃশ্য ভয়ঙ্কর ভূত প্রেত ও সাপ্‌কে মাথায় ও কাঁধে করিয়া রাখে, আর ক্রমাগত বিষ খায়—এ বেটা কে জান কি? ইনিই ভগবানের বিরাট্ ত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। পরম ধাম ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন,—তাই সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী, কৌপীনধারী। আবার আর এক দিক্ থেকে দেখ,—তিনি জীবকে সুখ, সম্পদ, ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য—সব দিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই, তাই তিনি

ফকির, শ্মশানবাসী। জগতে যাহাদিগকে সকলেই ঘৃণা করে, ভয় করে, কেহই আশ্রয় দেয় না, তিনিই কেবল তাহাদের আশ্রয়,—অশরণ-শরণ; তাই ভূত, প্রেত ও সর্পগণকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। আবার, জীবের যে গুলো প্রবল শত্রু,—ক্রমোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নকর—কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি—ইহারাই বিষ; তাই কৃপাময় জীব-হিতের জন্য সর্ব্বদাই বিষপান করিতেছেন।

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন যাঁহারা জগৎকে অসার ও মিথ্যা ভাবিয়া মোক্ষলাভের জন্য লালায়িত এবং জগতের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, মহাদেব সেইরূপ ত্যাগীরই আদর্শ।

সংসার-ত্যাগ মোক্ষ নহে।

গুরু। মহাদেবের ত্যাগ, মোক্ষের জন্য সংসার ত্যাগ নহে, সংসারের জন্য মোক্ষত্যাগ,—জীবহিতের জন্য পরম ধাম ত্যাগ। যাঁহারা ভাবেন জীবকে ও জগৎকে ভুলিয়া স্বার্থপর কঠোর সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়, প্রকৃত মোক্ষ কি বস্তু তাঁহারা জানেন না। প্রেমের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ না করিলে মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় না। জগৎ হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া একটি উচ্চ রাজ্যে গিয়া সুখ ভোগ করার নাম মোক্ষ নহে, জগতের সহিত নিজের সত্তাটি মিশাইয়া দেওয়াই মোক্ষ, সর্ব্বভূতকে আপনার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করাই মোক্ষ। আমিত্বের সঙ্কোচ মোক্ষ নহে, বিশ্বব্যাপী প্রসারই মোক্ষ। সুতরাং মুক্ত পুরুষ জীবের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারেন না, কারণ ইহাতে নিজের দুঃখেই উদাসীন থাকা হয়।

শিষ্য। একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যে "উচ্চতর লোক" "উচ্চ রাজ্য" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলেন এবং শাস্ত্রেও যে ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন প্রভৃতি লোকের

পরলোক।

কথা পাঠ করি, এ গুলি কোথায় ও কিরূপ? আমার তো মনে হয় এই পৃথিবীতে সব, পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করি। ইহা ছাড়া যে অন্য ভুবন বা জগৎ আছে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা অনেক সময় আমরা পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ বা নরক-যাতনা ভোগ করি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে পরলোক নাই তাহা নহে। পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ত্রিবিধ প্রমাণ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য। স্বয়ং দেখাই প্রত্যক্ষ। যাঁহারা গুপ্তবিদ্যা (Occult science) এবং যোগাদির দ্বারা দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance) লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তোমারও যদি প্রবল ইচ্ছা, উৎসাহ ও অধ্যাবসায় থাকে, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পার। বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা দ্বারা যেমন তুমি উত্তম গায়ক, চিত্রকর, রাসায়নিক বা যোদ্ধা হইতে পার, সেইরূপ কঠোরতর পরিশ্রম ও বিভিন্ন প্রকার সাধনা দ্বারা তুমি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার শক্তি লাভ করিতে পার, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিকতা নাই। শক্তিগুলি আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, তবে তাহাদের বিকাশ সাধনা-সাপেক্ষ। দিব্যদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের বাক্যই আপ্তবাক্য। তাঁহারা স্বয়ং দেখিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই পরলোকের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ।

শিষ্য। অনুমান দ্বারা কিরূপে পরলোক প্রমাণিত হয়?

গুরু। এই মনে কর পৃথিবীটি আমাদের সৌর জগতের একটি গ্রহ, কিন্তু ইহা একমাত্র গ্রহ নহে, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি আরও কতকগুলি আছে। আমরা দেখিতেছি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জীবের বাস। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য গ্রহ গুলিতে জীব থাকা অসম্ভব নহে। আবার ধর পদার্থের নানা অবস্থা আছে—কঠিন, তরল, বায়বীয়,

আকাশ ( Etheric ) ইত্যাদি। আমরা দেখিতেছি কঠিন পদার্থের দ্বারা জীবের দেহ নির্ম্মিত। ইহা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না কি যে, বায়বীয় বা সূক্ষ্মতর পদার্থের দেহবিশিষ্ট জীব থাকা অসম্ভব নহে? কঠিন দেহ হইতেই সূক্ষ্মদেহের অনুমান আসিয়া পড়ে। আবার দেখ অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সৌর জগৎ রহিয়াছে। আমাদের সৌর জগতের ন্যায় তাহারাও গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত। আচ্ছা, ভগবান কি কেবল আমাদের জগৎটিকেই জীব বাসোপযোগী করিয়াছেন? অন্যান্য সৌর জগতেও কি জীব থাকা অসম্ভব?

শিষ্য। তবে কি এই গ্রহ, তারা গুলি শাস্ত্রোক্ত ভুব, স্ব, মহ প্রভৃতি উচ্চতর লোক?

গুরু। না, ঠিক তাহা নহে। আচ্ছা, তুমি তো বিজ্ঞান পড়িয়াছ, পদার্থের কয়টি অবস্থা পরিজ্ঞাত আছ?

শিষ্য। চারিটি অবস্থা জানি—কঠিন, তরল, বায়বীয় ও ইথার ( Solid, Liquid, Gas, Ether )।

গুরু। বেশ। ইহার মধ্যে কঠিন অবস্থাটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তরল তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, বায়ু আরও সূক্ষ্ম, ইথার আরও সূক্ষ্ম। কেমন? এই নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

গুরু। আচ্ছা। এই ইথারের ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে আবার ৪টি অবস্থা আছে, ১নং ইথার, ২নং ইথার, ৩নং ইথার, ৪নং ইথার। ১নং অপেক্ষা ২নং, ২নং অপেক্ষা ৩নং এবং ৩নং অপেক্ষা ৪নং সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম। জড় বিজ্ঞান ইহা এখনও আবিষ্কার করে নাই, সে কেবল ১নং ইথার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত আছে। সে যাহাহউক,

এই সাতটি পদার্থের বা পদার্থের সাতটি অবস্থার ( কঠিন, তরল, বায়ু এবং ৪টি ইথারের ) নাম ক্ষিতিতত্ত্ব।

শিষ্য। উত্তাপদ্বারা কঠিন বস্তুকে তরল এবং তরলকে বাষ্প করা যায় জানি। কিন্তু বাষ্পকে ইথারে পরিণত করা যায় কি ?

গুরু। যায় বৈকি। তবে উত্তাপ দ্বারা নহে, অন্য উপায় আছে। সে যাক্। পূর্ব্বোক্ত সাতটি পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত তাহার নাম ভূর্লোক। আবার ৪নং ইথার অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম অপ্‌তত্ত্ব। ইহা দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত, তাহাই ভুবর্লোক।

শিষ্য। ঠিক বুঝিলাম না। ভুবর্লোক আছে কোথায় ?

গুরু। কেন ? ইথার যেমন সূক্ষ্ম বলিয়া কঠিন তরলাদি সকল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সকল বস্তুর ভিতর দিয়া অবাধে গতায়াত করিতেছে, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব আরও সূক্ষ্ম বলিয়া ইথারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

শিষ্য। তাহা হইলে ভুবর্লোক ভূর্লোকের মধ্যেই অবস্থিত। হয়ত ভুবর্লোকের অধিবাসিগণ আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে, অথবা এই ঘরের মধ্য দিয়া বা দেয়াল ভেদ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, অথচ আমরা স্থূল চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায় ?

গুরু। হাঁ তাই বটে। তবে পৃথিবীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও এই ভুবর্লোকটি পৃথিবীর ঠিক সমায়তন নহে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে শত শত মাইল বিস্তৃত। ভুবর্লোকের আবার দুইটি বিভাগ আছে,—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। অপেক্ষাকৃত স্থূল ভুবর্লোকটির নাম প্রেতলোক, এবং সূক্ষ্ম ভুবর্লোকের নাম পিতৃলোক।

শিষ্য। ভুবর্লোকে যে সকল জীব বাসকরে তাহাদের দেহ ও আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ ?

গুরু। তাহাদের দেহ অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। অপ্‌তত্ত্বের বিশেষ গুণ এই যে ইহা বাসনাময়। জীবের যত কিছু বাসনা আছে,—কাম, ক্রোধ, লোভ বা দয়া, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি সমস্তই এই অপ্‌তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। এই জন্যই এই দেহের নাম বাসনাদেহ এবং ভুবর্লোকের অপর নাম কামলোক। এখানে জীবমাত্রের বাসনা অতিশয় প্রবল।

শিষ্য। এখন স্বর্গ ও অন্যান্য লোকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিন।

গুরু। অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম তেজস্তত্ত্ব বা অগ্নিতত্ত্ব। এই তেজস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত যে জগৎ তাহাই স্বর্লোক বা স্বর্গ। অপ্‌তত্ত্ব যেমন ইথারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তেজস্তত্ত্ব সেইরূপ অপ্‌তত্ত্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং স্বর্গ ভুবর্লোকের মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহা ভুবর্লোকের সহিত সমবিস্তৃত (Co-extensive) নহে, ভুবর্লোকের পরিধির বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। স্বর্গবাসীর দেহ তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম, অর্থাৎ তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত এবং একটির ভিতরে আর একটি অবস্থিত।

শিষ্য। একটির মধ্যে আর একটি কিরূপে অবস্থিত ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছি না। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বিষয়টি পরিস্ফুট হয়।

গুরু। এই মনে কর এক গ্লাস জলে তুমি এক টুক্‌রা কাট বা সোলা ডুবাইয়া রাখিয়াছ। জল ঐ কাঠের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, বায়ু ঐ জলের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত, আবার ইথার ঐ বায়ুর

অন্তরে ও বাহিরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে। এখন মনে কর কাঠটি ভূলোক, জল ভুবর্লোক, বায়ু স্বর্গ এবং ইথার উচ্চতর লোক।

শিষ্য। কতকটা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, সকল গুলিতেই কি জীবের বাস ?

গুরু। জীব বাস না করিলে এগুলি সৃষ্ট হইবে কেন? যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ দেবগণ ভুবর্লোকে, আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ দেবগণ স্বর্গলোকে, এবং ঋষি, জীবন্মুক্ত, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি উচ্চতর পুরুষগণ উচ্চতর লোক গুলিতে বাস করেন।

শিষ্য। আর মানব? মানব কি এই ভূলোক ছাড়া অন্যত্র বাস করে না? তবে যে শুনিতে পাই মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যায়?

**বিভিন্ন দেহ বা কোষ।**

গুরু। শাস্ত্রে যে মানবের স্বর্গ গমনের কথা পাঠ করিয়াছ তাহা মিথ্যা নহে। এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। শ্রবণ কর। এই পৃথিবীর ভিতরে (ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বাহিরে) যেরূপ ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোকাদি অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক জড় পদার্থের, প্রত্যেক স্থূল দেহের ভিতরে (ও কিয়দ্দূর অবধি বাহিরে) অনেক গুলি সূক্ষ্ম দেহ বর্ত্তমান। মনে কর মানবদেহ। প্রথমতঃ তাহার স্থূল দেহ। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে দেহটি আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই তাহার ভিতরে ঠিক তৎসদৃশ একটি ইথারের দেহ রহিয়াছে। রক্ত মাংসের দেহটির নাম অন্নময় কোষ এবং ইথারের দেহটির নাম প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষে আমাদের জীবনী শক্তি (Vital energy) খেলিতেছে, সুতরাং ইহাই অন্নময় কোষকে ধারণ ও সংরক্ষণ করিতেছে।

অন্নময় ও প্রাণময় কোষকে সংক্ষেপে স্থূলদেহ বলে। আবার এই প্রাণময় কোষের মধ্যে, অপ্ তত্ত্ব নির্ম্মিত একটি দেহ রহিয়াছে। ইহার নাম বাসনা-দেহ ( Desire-body )। ইহার আকৃতি স্থূলদেহের ন্যায় নহে, কতকটা ডিম্বের ন্যায় ( oval ) ইহা স্থূল দেহের মধ্যে পরিব্যপ্ত হইয়া চতুঃপার্শ্বেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাসনা দেহের মধ্যে এইরূপ ডিম্বাকৃতি আর একটি দেহ বর্ত্তমান। ইহার নাম ভাবনা-দেহ ( Thought body or mind body )। ইহা তেজস্তত্ত্বের স্থূলাংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এই বাসনা-দেহ ও ভাবনা-দেহের সংক্ষিপ্ত নাম সূক্ষ্মদেহ বা মনোময় কোষ।

শিষ্য। আচ্ছা, একবার বলি, আপনি শুনুন। প্রথম, অন্নময় কোষ। ইহার মধ্যে প্রাণময় কোষ। ইহা ইথারে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে অপ্ তত্ত্ব-নির্ম্মিত বাসনা-দেহ। আবার তাহার মধ্যে ভাবনা দেহ। ইহা স্থূল তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। আর কোন দেহ আছে না কি ?

গুরু। আছে বৈকি। মনোময় কোষ বা ভাবনা দেহের মধ্যে আর একটি দেহ আছে। ইহা তেজস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। আবার বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত আরও দুইটি দেহ আছে; তাহাদের নাম যথাক্রমে আনন্দময় কোষ ও হিরণ্ময় কোষ। এই বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষকে সংক্ষেপে কারণ-শরীর বলে। ইহা মনে রাখিবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি :—

| | | |
|---|---|---|
| অন্নময় কোষ<br>প্রাণময় কোষ | ... ... | স্থূল শরীর। |
| মনোময় কোষ | ... বাসনা-দেহ<br>ভাবনা-দেহ | সূক্ষ্ম শরীর। |

বিজ্ঞানময় কোষ
আনন্দময় কোষ } ... ... } কারণ শরীর। *
হিরণ্ময় কোষ

শিষ্য। আচ্ছা, আমাদের এত গুলি দেহের প্রয়োজন কি ?

গুরু। এক একটি দেহের সহিত একএকটি জগতের ( বা এক এক প্রকার অনুভূতির ) সম্বন্ধ। স্থূল জগতের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্থূলদেহ থাকা চাই। সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির জন্য সূক্ষ্মদেহের এবং কারণ-জগতের অনুভূতির জন্য কারণ-দেহের প্রয়োজন।

শিষ্য। তবে কি স্থূলদেহ দ্বারা ভুব, স্বঃ প্রভৃতি লোকের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়?

গুরু। কিরূপে সম্ভব হইবে? জ্ঞান লাভ বা অনুভূতির অর্থ কি জান? বাহিরের স্পন্দন সর্ব্বদাই আমাদের দেহকে আঘাত করিতেছে। যখন আমাদের দেহটি ঠিক তদনুরূপ স্পন্দিত হয় বা তদাকারে আকারিত হয়, তখনই আমাদের একটি জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মে। এখন মনে কর তোমার সূক্ষ্মদেহ নাই; কেবল স্থূল দেহ আছে। অপ্‌তত্ত্বের বা তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করিবে কিসে? স্থূল দেহের দ্বারা? স্থূলদেহ অত সূক্ষ্ম আঘাতে স্পন্দিত হইতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্ম দেহ না থাকিলে ভুবর্লোকের বা স্বর্গের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব।

* নানাবিধ দেহ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু প্রণীত "আমি ও আমার দেহ" নামক পুস্তকে সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে।

শিষ্য। সূক্ষ্ম দেহ না থাকিলে আমরা উচ্চতর লোক দেখিতে পাই না, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের তো সূক্ষ্ম দেহ রহিয়াছে, তবে আমরা ভুবর্লোক দেখিতে পাইতেছি না কেন?

গুরু। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আচ্ছা, ঐ যে আমার পকেট-ঘড়ীটি হুক ঝুলিতেছে, উহা সর্ব্বদাই একটি টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছে। ঐ শব্দ কি তুমি শুনিতে পাইয়াছ বা পাইতেছ?

শিষ্য। আজ্ঞে না।

গুরু। কেন পাইতেছ না? তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় তো অক্ষুণ্ণ আছে। ঐ ক্ষুদ্র শব্দের স্পন্দন তো নিয়তই তোমার কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে। তবে তুমি শুনিতে পাইতেছনা কেন?

শিষ্য। নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে। ১ম, চতুর্দ্দিকের নানা-প্রকার শব্দ ও গোলমাল হয়ত ঐ ক্ষীণ আওজটিকে ডুবাইয়া দিতেছে। ২য়, আমার মন হয়ত অন্যদিকে আছে। ৩য়, যে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আবদ্ধ, ঐ শব্দটির স্পন্দন সংখ্যা হয়ত সেই সীমার মধ্যে নাই। কি কারণে ঘটিতেছে তাহা ঠিক করিতে হইলে, আমি প্রথমে বাহিরের শব্দ ও গোলমাল রুদ্ধ করিব, পরে শব্দটি শুনিবার জন্য মন একাগ্র করিব। ইহাতেও যদি শুনিতে না পাই বুঝিব যে, যে সংখ্যক স্পন্দন আমার কর্ণে পৌঁছিতেছে তাহা আমার শব্দ জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অর্থাৎ কর্ণ যে সংখ্যা হইতে যে সংখ্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম, ইহার স্পন্দন সংখ্যা তাহাপেক্ষা কম।

গুরু। সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে না পাইবার কারণও ঠিক তাই। সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দনে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ অনবরত স্পন্দিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ভূলোকের তীব্র ও প্রবল স্পন্দন এই সকল সূক্ষ্ম ও মৃদু স্পন্দনকে ডুবাইয়া দিতেছে। আমরা যদি পার্থিব সকল স্পন্দন দূর

করিতে পারি, মন হইতে পার্থিব যাবতীয় চিন্তা, কল্পনা ও ছবি বিদূরিত করিয়া চিত্তকে শূন্য ও একাগ্র করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সূক্ষ্ম স্পন্দন আমাদের মস্তিষ্কে পঁহুছিবে, আমরা ভুবর্লোক দেখিতে পাইব।

শিষ্য। কিন্তু আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটা সীমা আছে তাহার কি? এতগুলি হইতে এতগুলি পর্য্যন্ত স্পন্দনে আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই। যদি ভুবর্লোকের স্পন্দন ঐ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে পড়ে?

গুরু। এই নির্দ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করা যায় না, ইহা তোমাকে কে বলিল? কিছুকাল একাগ্রতা অভ্যাস কর, বুঝিতে পারিবে। যে সকল ক্ষুদ্র কীট সাধারণ দৃষ্টির অগোচর তাহা দেখিতে পাইবে, যে সকল ক্ষীণ শব্দ অপরে শুনিতে পায় না তাহা শুনিতে পাইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, মানব স্থূল জগতের সকল স্পন্দন ও চিন্তা দূর করিয়া যদি মনকে শূন্য ও একাগ্র করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সূক্ষ্মদর্শন হওয়া অসম্ভব নহে কতকটা বুঝিলাম। এখন মৃত্যুর পরে কি ঘটে কৃপা করিয়া বলুন।

মৃত্যুর পরে।

গুরু। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা আর কিছুই নহে, এই স্থূলদেহের ত্যাগ। বহিরাবরণটি খসিয়া যাওয়ার নামই মৃত্যু। পাঁচপুরু কাপড়ে একটি হীরকখণ্ড জড়ানো আছে, যদি বহির্বস্ত্রটি খুলিয়া লওয়া হয়, দ্বিতীয় বস্ত্রটি বাহির হইয়া পড়ে। ইহাও সেইরূপ। স্থূলদেহ (অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ) খসিয়া গেলে বাসনা-দেহটি বাহির হয়, জীবাত্মা এই বাসনা-দেহে প্রেতলোকে বিচরণ করে। এই প্রেত লোকটি ভুবর্লোকের স্থূলাংশ, অর্থাৎ অপ্‌তত্ত্বের স্থূল পরমাণু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। এখন ঐ মানবের

অবস্থাটি ভাবিয়া দেখ। ভূলোকের স্পন্দন তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, কারণ স্থূলদেহ নাই; সুতরাং পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে তাহা সে জানিতে পারে না। সে এখন ভুবর্লোকের স্পন্দনই গ্রহণ করে, ভুবর্লোকই দেখিতে পায়। কিন্তু তাহার মনের বা বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। এখানে যেরূপ ছিল, সেখানেও ঠিক সেইরূপ থাকে, কেবল স্থূলদেহ নাই,—কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলির অভাব। যাহার ধনলোভ প্রবল ছিল সে ধনের তীব্র বাসনায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, যাহার কাম প্রবল ছিল, সে স্ত্রীসম্ভোগের দুর্দ্দমনীয় বাসনায় পুড়িতে থাকে, যে মাতাল ছিল সে সুরাপান লালসায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে,— অতৃপ্ত বাসনার তীব্র কষাঘাতে ছটফট করে। বাসনা তৃপ্ত করিবার উপায় নাই, কারণ কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, ভোগ্য বস্তু নাই। কিছুকাল এইরূপ ভুগিতে ভুগিতে তাহার বাসনাগুলি নিস্তেজ হয়, কামদেহের স্থূল পরমাণু গুলো ঝরিয়া যায়, সে পিতৃলোকে উন্নীত হয়। এখানেও বাসনা থাকে কারণ বাসনা-দেহ সে এখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই, তবে নীচ পার্থিব ও স্থূল বাসনার পরিবর্ত্তে সে এখন কতকটা উচ্চ ও সূক্ষ্ম বাসনা অনুভব করে। যশ, মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি বা অন্য কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাহার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য বা কলাবিদ্যাদির প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাই এখন জাগিয়া উঠে, এই সকল কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়; কিছুকালের মধ্যে এগুলি ক্ষীণ ও লীন হয়, স্বার্থময় বাসনা মাত্রই বিলুপ্ত হয়। তখন তার দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটে, সে বাসনা-দেহটি ত্যাগ করে। এই পরিত্যক্ত দেহটি ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে এবং ভাবনা-দেহে সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়। এই ভাবনা-দেহটি কামগন্ধ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ স্বার্থপর বাসনার লেশমাত্র ইহাতে নাই; সুতরাং পৃথিবীতে সে যাহা কিছু

নিঃস্বার্থ ভাবে করিয়া গিয়াছে, দয়া, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, পরোপকার, ত্যাগ, দান, পরার্থে বিদ্যানুশীলন ইত্যাদি—সমস্তই শতগুণ তেজে তাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠে, সে শতগুণ উৎসাহে, শতগুণ বলে, শতগুণ আনন্দে তাহাদের পুনরভিনয় করিতে থাকে। এখানে দুঃখ নাই, কারণ স্বার্থ নাই, ক্ষুদ্রত্ব নাই; সে সদাই বিমল আনন্দে বিভোর। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে তাহার ভাবনা-দেহটি খসিয়া যায়, তাহার তৃতীয়বার মৃত্যু ঘটে। সে তখন বিজ্ঞানময় কোষে উচ্চতম স্বর্গে গমন করে। কিন্তু অধিকাংশ মানবেরই এই দেহটি (বিজ্ঞানময় কোষ বা কারণ-শরীর) এখনও সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হয় নাই, সুতরাং দেহটি আশ্রয় করিবামাত্র সে কিয়ৎ কালের জন্য অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। অতঃপর পূর্ব্ব সঞ্চিত বাসনা বলে তাহার পুনরায় সংসারের দিকে গতি হয়,—সে স্বর্গলোক ও ভুবর্লোক ভেদ করিয়া এবং তত্তৎ উপাদানে নির্ম্মিত এক একটি নূতন সূক্ষ্ম কোষ লাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

শিষ্য। এখন কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম, ভুবর্লোক ও ও স্বর্গলোকে কতকাল বাস করিতে হয়? সকলকেই কি সমকাল বাস করিতে হয়, না কিছু ইতর বিশেষ আছে?

গুরু। সাধারণ মানবের পক্ষে এই পৃথিবীটাই কেবল কর্ম্মক্ষেত্র, ভুবঃ ও স্বর্গলোক ভোগক্ষেত্র, অর্থাৎ এখানে সে যেরূপ কর্ম্ম করে ঐ দুই লোকে তদনুরূপ ফল ভোগ করে। সুতরাং দুষ্কর্ম্মদ্বারা যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ঐহিক আসক্তিটাকে খুব প্রবল করিয়া দেয়, সে ভুবর্লোকে অনেক কাল যাতনা ভোগ করে। আর যিনি দয়া, ভক্তি, পরোপকার প্রভৃতি নিঃস্বার্থ ভাব ও কর্ম্মদ্বারা ইহ জীবন যাপন করেন, তাঁহাকে ভুবর্লোকে অতি অল্পকাল, বাস করিতে হয় (হয়ত যাতনা আদৌ পাইতে হয় না), এবং স্বর্গে তিনি অনেক কাল সুখ ভোগ করেন। মনে

কর একটা বাদ্যযন্ত্রে কতকগুলি মোটা ও কতকগুলি সরু তার আছে। তুমি উহা বাজাইয়া রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ তারগুলি কাঁপিয়া শেষে আপনিই থামিয়া যায়। তুমি যত জোরে তারগুলিকে আঘাত করিবে, থামিবার পর তাহারা তত অধিক স্পন্দিত হইবে। ধর, আমাদের বাসনা-দেহই এই মোটা তার এবং ভাবনা-দেহ সরু তার। যদি মোটা তার গুলিকেই আঘাত করিয়া ছাড়িয়া দাও, সরু তার স্পর্শই না কর, তাহা হইলে থামিবার পর মোটা তার গুলিই কাঁপিবে, সরু তার কাঁপিবে না; অর্থাৎ ভুবর্লোকে যাতনা ভোগ করিয়াই তোমাকে ফিরিতে হইবে, স্বর্গসুখ ঘটিবে না। আবার যদি মোটাগুলিকে খুব মৃদুভাবে ও সরুগুলিকে জোরে আঘাত করিয়া ছাড়িয়া দাও, মোটাগুলি একটু কাঁপিয়াই থামিবে, সরুগুলি অনেকক্ষণ কাঁপিবে। অর্থাৎ ভুবর্লোকে ঈষৎ ক্লেশ পাইয়াই বহুকাল স্বর্গে সুখভোগ করিবে। আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাইতেছি, কেহ মোটা তারে এবং কেহ বা সরু তারে আঘাত করিতেছি, কাজেই আমাদের ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে বাস কখনও একরূপ হইতে পারে না।

শিষ্য। বুঝিলাম। আচ্ছা, এই ভুবর্লোকেই কি পুরাণাদি-বর্ণিত নরক এবং খৃষ্টানদিগের Purgatory ?

গুরু। হাঁ। তবে পুরাণে কুম্ভীপাকাদির যে বর্ণনা আছে তাহা রূপক মাত্র, অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিলে চলিবে না। পাপিগণ যে ভীষণ যাতনা ভোগ করে তাহা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য, ঋষিরা এই সকল রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে ভীষণ যাতনা, ইহার শান্তি কিসে হয়? এ রোগের কোনও চিকিৎসা নাই কি?

গুরু। ভোগেই ইহার শান্তি। তবে আমরা চেষ্টা করিয়া যাতনার তীব্রতা ও ভোগকাল কতকটা কমাইতে পারি। একটি তার যে সুরে বাজিতেছে উহাকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে কাঁপাইয়া দিলে আওয়াজটি বন্ধ হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা—এগুলি আর কিছুই নয়, সূক্ষ্মদেহের বিশেষ বিশেষ স্পন্দন মাত্র; এক প্রকার স্পন্দনের নাম কাম, আর এক রকম স্পন্দনের নাম ক্রোধ ইত্যাদি। এখন মনে কর, একটি প্রেতের বাসনা-দেহ ক্রোধের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে, অতৃপ্ত প্রতিহিংসার জ্বালায় সে ছট ফট করিতেছে। তুমি যদি উহাতে বিপরীত বল প্রয়োগ করিতে পার, যদি উহাতে ক্ষমার বা তিতিক্ষার স্পন্দন উৎপাদন করিতে পার, তাহার ক্রোধ থামিয়া যাইবে, যাতনার শান্তি হইবে।

প্রেতের যাতনা-শান্তি।

শিষ্য। তাহা যেন হইল। কিন্তু আমি আছি এই ভূলোকে, আর তিনি আছেন ভুবর্লোকে; আমি তাঁহার দেহে বিপরীত স্পন্দন উৎপাদন করিব কি রূপে?

গুরু। চিন্তা ও মন্ত্রের দ্বারা। তুমি যদি নিয়ত তাঁহার মঙ্গল কামনা কর, যদি দয়া, ভক্তি, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি ভাবে নিজে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা কর যে তাঁহাতেও এই ভাব গুলি সঞ্চারিত হউক, তাহা হইলে তোমার সূক্ষ্ম দেহের স্পন্দন অপ্‌তত্ত্ব ভেদ করিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম দেহে অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতে থাকিবে, অচিরে তাঁহার কাম, ক্রোধ ও ভোগলালসাদি প্রশমিত হইবে, তিনি যাতনামুক্ত হইয়া উচ্চতর লোকে উন্নীত হইবেন। মন্ত্রও এইকার্য্যে বিলক্ষণ সহায়তা করে। মন্ত্র কি? কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। এই অক্ষর গুলি

এরূপে সংযোজিত হইয়াছে (দিব্যদর্শী ঋষিদিগের দ্বারা) যে উহা উচ্চারণ করিবামাত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন উত্থিত হয়। সিদ্ধ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে মনের গতি নিয়মিত হয়, চিত্ত স্থির ও শান্ত ভাব ধারণ করে, কুভাব ও কুচিন্তা বিদূরিত হয়। অতএব কোন প্রেতের উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার সূক্ষ্ম দেহে শুভ স্পন্দন উত্থিত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণা-মুক্ত করে।

শিষ্য। তা যদি হয়, তবে এরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা নাই কেন?

গুরু। ব্যবস্থা নাই কে বলিল? সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ কার্য্যটা কি, কখনও ভাবিয়াছ? খৃষ্টান, মুসলমানাদির মধ্যেও প্রেতের সদ্গতির নিমিত্ত উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে কেবল শুভচিন্তারই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রাদ্ধে চিন্তা ও মন্ত্র—দুইটি শক্তিই সমবেত হয়, সুতরাং উদ্দেশ্যটা শীঘ্রই সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। শ্রাদ্ধ-রহস্য আজ কতকটা বুঝিলাম। আচ্ছা, আপনি বলিলেন সকল জীবেরই অন্নময়াদি পাঁচটি কোষ আছে। একটি বৃক্ষেরও আছে এবং ব্যাসদেবেরও আছে। তবে এ দু'য়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন?

গুরু। এই দুইটি জীবের পাঁচটি কোষ আছে সত্য, কিন্তু বৃক্ষের একটি কোষও সুনির্ম্মিত ও কার্য্যোপযোগী হয় নাই, ব্যাসদেবের সকল কোষই সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম। এই জন্যই দু'য়ে এতো প্রভেদ।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। জীবের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি কিরূপে হইতেছে তাহা অগ্রে বুঝা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান ঈশ্বর রূপে আবির্ভূত হইয়া প্রথমে মহৎ, অহঙ্কার, ও ক্ষিত্যপ-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমাদি ভূতের সৃষ্টি করেন। তৎপরে দেব সৃষ্টি, পরিশেষে অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হয়। যেমন এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই মহাচৈতন্য হইতে অসংখ্য খণ্ড চৈতন্য বিনিঃসৃত হয়। এক একটি খণ্ড চৈতন্যই এক একটি জীব, এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। এই জীবসঙ্ঘের অধোমুখে গতি হয় অর্থাৎ সূক্ষ হইতে ক্রমশঃ স্থূলতর আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহারা নিম্নাভিমুখে আসিতে থাকেন। প্রথমে মহত্তত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তার পর অহঙ্কার তত্ত্বের পাতলা খোলস, তার উপর ব্যোমাদি ক্ষিত্যন্ত ক্রমশঃ স্থূলতর আবরণে এইরূপে আচ্ছাদিত হইয়া তিনি পৃথিবীতে খনিজ পদার্থরূপে আবির্ভূত হন। লোহা সোণা বা পাথরের মধ্যে যে জীবাত্মা অবস্থিত, তিনি এরূপ প্রচ্ছন্ন, প্রসুপ্ত ও অচেতন যে তাঁহার কোন অভিব্যক্তি নাই বলিলেও চলে। লক্ষ লক্ষ বৎসর উত্তাপ, শৈত্য ও বজ্রপাতাদির ভীষণ আঘাতে ইহার বহিরাবরণটি যতই স্পন্দিত হইতে থাকে ততই একটি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র সুখ বা দুঃখের অস্পষ্ট অনুভূতি ক্রমশঃ ইহার অন্তরে জাগিতে থাকে। যেমন সুখের অনুভূতি হয় অমনি তাহা পুনরায় ভোগ করিবার বাসনা জন্মে এবং যেমন দুঃখের অনুভূতি অমনি তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবে তাঁহার বহিরাবরণটি গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির কতকটা উপযোগী হয়। তখন সেই জীবাত্মা খনিজাবস্থা ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসর নানা বৃক্ষ মধ্যে ভূপৃষ্ঠে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। বসন্ত-বায়ুর মৃদুস্পর্শে, বর্ষার কোমল

জীবের ক্রমোন্নতি।

ধারা-সম্পাতে, ভীষণ ঝটিকায়, প্রচণ্ড উত্তাপে বা পশ্বাদির আক্রমণে তাহার বহিরাবরণটি নিয়ত কম্পিত ও আলোড়িত হওয়ায়, তাহার চৈতন্য আরও স্ফূর্ত্তি পায়, সুখ-দুঃখের অনুভূতিটি স্থায়ী ও তীব্র হইতে থাকে, সুখ ভোগের ও দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা প্রবলতর হয়। তখন সে যে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, সে ছাড়া যে একটা বহির্জগৎ আছে—এই জ্ঞান উদিত হয় এবং এই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎটা দেখিবার—ভোগ করিবার বলবতী বাসনা জাগিয়া উঠে। এই বাসনা তাহার স্থূল আবরণের উপর এরূপ শক্তি বিস্তার করে যে উহা নবভাবে গঠিত হয়, উহাতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয়, প্রত্যুত সে এখন উদ্ভিদবস্থা ত্যাগ করিয়া পশু শ্রেণীতে উন্নীত হয়। লক্ষাধিক বৎসর নানা পশুদেহে বাস করিয়া, অসংখ্য সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে, যখন তাহার ইন্দ্রিয়গুলি বেশ সতেজ ও বলবান হয়, যখন কাম, ক্রোধ, লোভ হিংসাদি বেশ পরিপুষ্টি লাভ করে, যখন মানসিক শক্তি ( যথা স্মৃতি, কল্পনা, ধারণাদি ) ঈষৎ অঙ্কুরিত হয়, তখন তাহার দেহ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া নরদেহে পরিণত হয়।

শিষ্য। কিন্তু বৃক্ষ ও মানবের যে এত প্রভেদ কেন তাহা তো বুঝিলাম না। বৃক্ষে যে আত্মা, মানবেও সেই আত্মা; বৃক্ষের পাঁচটি দেহ, মানবেরও পাঁচটি দেহ।

গুরু। এইখানেই ভুল করিলে। বৃক্ষের পাঁচটি কোষ আছে বটে, কিন্তু কোষ আর দেহ এক জিনিষ নহে। জীবাত্মা নামিবার সময় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্যোমতত্ত্ব প্রভৃতি যে আবরণ গুলির দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, সেই আবরণ গুলিই এক একটি কোষ। এই কোষগুলি তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ ঢাকিয়া ফেলে, এই জন্যই এই অধোগমনকে ক্রমঃ-আচ্ছাদন ( Involution ) বলা হয়। পৃথিবীতে

আসিয়া সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রামের দ্বারা সে এক একটি কোষ হইতে এক একটি দেহ নির্ম্মাণ করে এবং উদ্ভিদ্, পশু, মানব ও দেবতাদির পদ লাভ করতঃ ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে। এই দেহগুলি তাহার জ্যোতিকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশ করে। এই জন্যই এই উর্দ্ধগমনের নাম ক্রম-বিকাশ ( Evolution )। এখন কোষ ও দেহে প্রভেদ বুঝিলে তো? কোষ যেন কতকগুলো মাল-মসলা, আর দেহ যেন একটি সুনির্ম্মিত অট্টালিকা। জীবাত্মারূপ মিস্ত্রি কতকগুলো মাল-মসলার বোঝা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং ইহাদ্বারা এক একটি বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। যখন সকল গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়া যায়, তখন তাহার কার্য্য শেষ হয়, তখন সে স্বচ্ছন্দে নিজধামে বাস করিতে পারে, অথবা যে গৃহে ইচ্ছা সেই গৃহে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পারে।

শিষ্য। তাহা হইলে দেহ নির্ম্মাণের নামই কি ক্রমোন্নতি? দেহ-নির্ম্মাণের জন্যই কি আমাদের পৃথিবীতে আসা?

গুরু। ঠিক তাই। আত্মা নিত্য ও পূর্ণ, তাঁহার উন্নতি ও অবনতি নাই। এই দেহ বা উপাধিগুলি যতই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে এবং যত অধিক সংখ্যক উপাধি আমরা নির্ম্মাণ করিতে পারিব, আত্মা ততই প্রকাশিত হইবেন। যেমন একই আলোক নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই আত্মা বিভিন্ন উপাধিতে বিভিন্ন চৈতন্যরূপে প্রকটিত হন। আর একটি উপমা দিতেছি শুন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একটিমাত্র মূল শব্দ আছে। তাহা অজ্ঞাত ও অব্যক্ত অর্থাৎ কিম্বিধ ও কিম্ভুত কেহই জানে না। পৃথিবীতে আমরা যত শব্দ শুনিতে পাই, সূচি পতনের শব্দ হইতে মেঘগর্জ্জন, যাবতীয় জীবের কণ্ঠস্বর, যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি

প্রভৃতি যত কিছু শব্দ জগতে আছে, সমস্তই সেই এক মূল শব্দ হইতে উৎপন্ন,—তাহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র (different manifestations)। এখন মনে কর এক সুনিপুণ শিল্পী তোমাকে কাঠ, লোহা, তামা, রূপা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া এক কারখানাতে পাঠাইলেন। তুমি সেখানে দিবারাত্রি খাটিয়া নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলে। অবশ্য তোমার যন্ত্রগুলি প্রথমে মোটা ও অসম্পূর্ণ হইতে লাগিল, উহা হইতে ভাল সুর বাহির হয় না। ক্রমে তুমি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিলে। এইরূপে তুমি যতই সূক্ষ্ম তার যোজনা করিতে লাগিলে, যতই কোমল পর্দ্দা বসাইতে শিখিলে, তোমার বাদ্যযন্ত্র হইতে ততই সুন্দর ও সুমধুর স্বর নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে তুমি দেখিলে, তোমার যন্ত্রগুলি পূর্ণতার সীমায় উপনীত হইয়াছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট উপকরণ দ্বারা পূর্ণতর বা সূক্ষ্মতর যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না—হয়ত তার কাটিয়া যায়, বা কাঠ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তুমি বুঝিবে তোমার কারখানার কাজ ফুরাইয়াছে, তুমিও এক একজন শিল্পী হইয়াছ, তখন তুমি ঐ সকল উপকরণ দ্বারা যে যন্ত্র ইচ্ছা সেই যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারিবে। আচ্ছা, এখন কি বুঝিলে বল দেখি।

শিষ্য। আজ্ঞে, এখানে মূল অব্যক্ত শব্দটি ব্রহ্ম বা আত্মা, সুনিপুণ শিল্পী ঈশ্বর, আমি একটি জীব ( monad ), কাঠ-লোহাদি উপকরণ ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত বা প্রকৃতি ( matter ), কারখানা এই বিশ্বসংসার, বাদ্যযন্ত্র নানাবিধ দেহ বা উপাধি এবং যন্ত্রের সুর জীবের অনুভূতি বা জ্ঞান ( consciousness )। বুঝিলাম এই যে, জীবাত্মা ক্ষিত্যপ্‌তেজাদির আবরণে জড়িত হইয়া এই পৃথিবীতে আসে এবং বহু সংগ্রামের পর এগুলিকে বশীভূত করিয়া এতদ্দ্বারা এক একটি দেহ নির্ম্মাণ করে। এই দেহ যতই সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল হয়, আত্মা ইহাতে ততই বিকাশ পান, অর্থাৎ

ততই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। অবশেষে, তাঁহার দেহ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজাদির দেহ যতটা পূর্ণ হইতে পারে ততটা যখন হয়, তখন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। এখন একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যখন তিনি সকল রকম যন্ত্রই প্রস্তুত করিতে শিখিলেন—সর্ব্বপ্রকার উপাধি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, তখন উহার অবস্থাটি কিরূপ?

গুরু। তখন তিনি একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইয়াছেন, একটি ব্রহ্মা হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতি-জাত অসংখ্য ভূতকে (ক্ষিত্যপ্‌তেজাদিকে) যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে চালাইতে ফিরাইতে, গড়িতে ভাঙ্গিতে সমর্থ, সুতরাং একটি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ তাঁহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। এখন তিনি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছেন,—স্ববশে আনিয়াছেন; তিনি আর প্রকৃতির দাস নহেন, প্রভু। এখন একটা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার দেহ বা উপাধি। ব্রহ্মাণ্ড কি জানতো? এক একটা সৌরজগৎই এক একটা ব্রহ্মাণ্ড। আমার কিম্বা তোমার যেমন সাড়ে তিন হাত পরিমিত এক একটি দেহ আছে, সেইরূপ গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত একটা গোটা সৌরজগৎই তাঁহার দেহ। আমাদের এই ক্ষুদ্রদেহে অনন্ত ব্রহ্মের (বা আত্মার) যতটুকুই প্রকাশ পায়, ততটুকুই যেমন আমাদের চৈতন্য (consciousness) সেইরূপ তাঁহার এই বিরাট দেহে অনন্ত ব্রহ্মের যতটা প্রকাশ পায় ততটা তাঁহার চৈতন্য। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের (microcosm এর) মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আছে, তাঁহার দেহের (macrocosm এর) মধ্যেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আছে। সমগ্র ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোকই তাঁহার স্থূলদেহ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারি লোক তাঁহার সূক্ষ্মদেহ এবং তদতীত অবস্থাই তাঁহার কারণ দেহ। আমরা যেরূপ জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে এবং স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে বাস করি, তিনিও সেইরূপ যত দিন জাগরিত থাকেন,

তত দিনই ভূ, ভুব, স্বঃ থাকে, নিদ্রিত হইলে এ গুলি থাকে না, লয় পায়। এই জন্যই তাঁহার নিদ্রার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। আমাদের ১২ ঘণ্টা দিবা, ১২ ঘণ্টা রাত্রি,, তাঁহার এক কল্প দিবা, এক কল্প রাত্রি। এক কল্প = চারশ' বত্রিশ ( ৪৩২ ) কোটি বৎসর। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের যেমন জন্ম ও মৃত্যু আছে, তাঁহার বিরাট দেহেরও সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু আছে। তাঁহার জন্মের নাম ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব বা সৃষ্টি, এবং মৃত্যুর নাম মহাপ্রলয়। আমাদের মৃত্যু হইলে, যেমন আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, এবং আমরা কিছুকাল কারণাতীত অবস্থায় অবস্থান করি, তাঁহার মৃত্যু হইলেও সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহটি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, ক্ষিতিতত্ত্ব অপ্‌তত্ত্বে, অপ্‌তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহৎ প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং তিনি সেই কারণ্যতীত অনন্ত সৎ-এ বিলীন হইয়া যান।

শিষ্য। সবই তো অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। তখন তবে থাকে কি ?

গুরু। থাকেন কেবল মায়া। যেখানে সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড ছিল, এখন সেখানে আর কিছু নাই, আছেন কেবল এক অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি মায়া।

শিষ্য। এই মায়াটি কি ?

গুরু। মায়া কি, বলা বড় কঠিন। তবে এক দিক থেকে বলা যায়, উপাধি নির্ম্মাণের শক্তিই মায়া। এ শক্তি কার ? ব্রহ্মের। এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম বা আত্মা অসংখ্য উপাধি নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

শিষ্য। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আচ্ছা, সেই বাষ্পযন্ত্রের উপমাটাই লও। তুমি সমস্ত দিন শ্রম ক'রে একটা নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিলে। রাত্রে যখন নিদ্রা যাও, ঐ নির্ম্মাণ শক্তিটা কোথায় থাকে? লোপ পায় কি? কখনই না, কারণ ঘুম ভাঙ্গিলেই উহা আছে জানিতে পার। তোমার নিদ্রাবস্থায় যেমন ঐ শক্তিটি তোমার মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, সেইরূপ মানবের মৃত্যুর পর তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, সে ঐ জীবনে যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছে,—স্মৃতি, বুদ্ধি, কল্পনা, রচনা শক্তি বা দয়া, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি—যাবতীয় শক্তি, বীজভাবে তাহার কারণ দেহে অবস্থান করে। এই শক্তিপুঞ্জের নামই মায়া, কারণ উহাই উক্ত জীবাত্মার উন্নতির পরিমাপক ও পরিচায়ক, উহা দ্বারাই বুঝা যায় ঐ জীবাত্মা কতদূর উন্নত হইয়াছেন, কতদূর সূক্ষ্ম উপাধি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম। জীবাত্মা যতকাল কারণ দেহে ( বা কারণাতীত অবস্থায় ) থাকেন, এই শক্তিপুঞ্জ বীজভাবে তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে এবং যখন তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হন, এই শক্তিপুঞ্জই তাঁহার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ নিয়মিত করে। মানবের পক্ষে যে নিয়ম, ব্রহ্মার পক্ষেও ঠিক তাই। মহাপ্রলয়ের সময় তিনি পরব্রহ্মে লীন হইলে, যেখানে ব্রহ্মাণ্ড ছিল সেখানে থাকেন কেবল মায়া। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহধারণ কালে তাঁহার যে জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা বা দয়া, প্রেম প্রভৃতি ছিল, সেই সমস্ত শক্তিই অনন্ত শূন্যের সেই নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে থাকিয়া যায়, তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে। ইহা কিরূপ জান? একটা খোলস বা আবরণের মত। যে খোলসটি পরিয়া তিনি এতকাল আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্রষ্টা, কর্ত্তা ও পাতা হইয়াছিলেন, এখন সেই খোলসটি ছাড়িয়া অসীম হইয়া যান। খোলসটি শূন্যে ঝুলিতে থাকে। আবার সহস্র সহস্র কল্পান্তে তিনি যেমন এই খোলসটি পরিধান করেন অমনি তাঁহার

যাবতীয় পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে, তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলেন "বাছারে, তোদের এতদিন ভুলিয়াছিলাম। আয় তো'দিগকেও সেই অনন্তের সুখভাগী করিব।" এই বলিয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডাদি রচনা করেন।

শিষ্য। তা'হলে বুঝিলাম যে এই খোলসটিই ( মায়াই ) জীবের শেষ উপাধি। এই উপাধিটি নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই জীব ঈশ্বর হইয়া যান। আচ্ছা, প্রত্যেক জীবই কি এক একটি ঈশ্বর হইবেন ?

গুরু। নিশ্চয়ই। জীব যে কি বস্তু তাহা কি ভুলিয়া গেলে ? স্বয়ং ব্রহ্মই জীব, সুতরাং জীবের শক্তির সীমা আছে কি ? একবার অনন্ত শূন্যের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে কোটি কোটি সৌরজগৎ উহাতে বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এক একটি সৌরজগৎই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেরই এক এক জন ঈশ্বর বা ব্রহ্মা আছেন। ইঁহারা পূর্ব্বে তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবই ছিলেন, কোটি কোটি কল্পে ক্রমোন্নত হইয়া এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন। এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কি জান ? অনন্ত ব্রহ্মের এক একটি শক্তিকেন্দ্র বা লীলা-ক্ষেত্র। এইরূপ কোটি কোটি,—শক্তিকেন্দ্র তাঁহাতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া আরও কোটি কোটি শক্তিকেন্দ্র নির্ম্মিত হইবে। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন আপনাকে অসংখ্যরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ( অসংখ্য মায়ার খোলস পরিয়া ) অসংখ্য ঈশ্বর-রূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও পালন করেন। আবার যখন তাঁহার লীলা সাঙ্গ হয়, তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন থাকেন কেবল তিনি একাকী—একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য শক্তিকেন্দ্রে তাঁহার অনন্ত মায়া ( বা বিশ্ব-রচনা-শক্তি ) অতি সূক্ষ্ম ভাবে—বীজ ভাবে অবস্থান করে, এবং তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা

করে। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইলে, আবার তিনি প্রকাশিত হন, আবার অসংখ্য শক্তিকেন্দ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়। এই প্রকাশ ও অন্তর্ধান, আবির্ভাব ও তিরোভাব, সৃষ্টি ও লয় অনন্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিয়াছে। ইহাই তাঁহার লীলা, তাঁহার খেলা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব—যাবতীয় পদার্থ ঠিক এই খেলাই খেলিতেছে,. স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে এই লীলারই অভিনয় করিতেছে,—বিরাট বিশ্বনৃত্যের ঠিক তালে তালে নাচিতেছে। জন্ম মৃত্যু, জাগরণ সুষুপ্তি, যৌবন জরা, বসন্ত শীত, জোয়ার ভাটা, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ইত্যাদি সমস্তই এই বিশ্বনৃত্যের এক একটি ক্ষুদ্র অভিনয় মাত্র—যবনিকার বাহিরে আসা এবং ভিতরে যাওয়া—আর কিছুই নহে। * একই প্রাণ,—একই বস্তু অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একই লীলার অভিনয় করিতেছেন; অভিনেতা একজন, নাটক বা বিষয়ও একটি, কেবল পোষাক অসংখ্য,—ইহাই জগৎ, ইহাই সব!

শিষ্য। প্রভো, আজ আপনার কৃপায় অনেক শিখিলাম, অনেক বুঝিলাম। আজ গীতার,

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।"

"অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

গুরু। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। গীতা বুঝিলেই সব বুঝা হয়।

*এই বিষয়টি "ত্রিমূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পরিশিষ্ট (গ) দেখুন।

শিষ্য। আপনার কৃপায় জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিলাম। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে যে সকল আচার অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কিছুই বুঝি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন হিন্দু যুবকগণ অন্ধভাবে কিছুই মানিতে চান না। সুতরাং কবচ ধারণ, গঙ্গাস্নান, মন্ত্রজপ, তীর্থভ্রমণ, মূর্ত্তিপূজা, শ্রাদ্ধতর্পণ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি আচার গুলিকে তাঁহারা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন। এগুলি কি বাস্তবিকই কুসংস্কার? না, ইহাদের মূলে কোনও সত্য আছে?

হিন্দু আচার।

গুরু। হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম,—যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ইহাতে যে মোটেই আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয় নাই, ইহা আমি বলি না। তবে অধিকাংশ আচারেরই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। যথাযথ পালিত হইলে এগুলি দ্বারা আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। ধারাবাহিক ক্রমে তোমাকে কতকগুলি আচারের রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎটা যবনিকা। ইহার অন্তরালে সূক্ষ্ম জগৎ আছে। এই সূক্ষ্ম জগতে যে কত রহস্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। ইহার দু'একটি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রায় সকল দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, মাদুলি বা কবচাদি ধারণ করিবার একটা প্রথা বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। রোগমুক্তির জন্য, দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য, অপদেবতার ভয় হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কোন অভীষ্ট কার্য্যে সাফল্য লাভের জন্য,—নানা উদ্দেশ্যে কবচ ধারণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় কিন্তু, এ প্রথাটাকে বড় সু-নজরে দেখেন না, বরং কুসংস্কার ও

শিক্ষিতের হেতুবাদ।

মূর্খতা বোধে অন্তরের সহিত ঘৃণাই করেন। এ জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমরা দোষ দিই না, বরং প্রশংসাই করি। কারণ, তাঁহারা হেতু-বাদী,—যুক্তিবাদী; না বুঝিয়া, অন্ধভাবে কিছুই বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা সকল বিষয়ের কারণ জানিতে চান। তাঁহারা বলেন, "কেন এরূপ হইবে, কি কারণ-পরম্পরা দ্বারা এই দুইটি ঘটনা পরস্পর সম্বন্ধ (যেমন উত্তাপের সহিত বাষ্পের, বাষ্পের সহিত মেঘের সম্বন্ধ), ইহা যতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ কাহারো মুখের কথায় বিশ্বাস করিব না। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসই সকল অনর্থের মূল, কারণ, উহাই জগতে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আনিয়াছে।" ঠিক কথা। এই যে, সকল বিষয় বুঝিবার চেষ্টা,—সকল বিষয়ের কারণ জানিবার ইচ্ছা,—ইহা একটি ঐশী শক্তি, ইহা ভগবানের অমূল্য দান। ইহা যেন চিরকাল মানবে অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু মানবের দোষ এই যে, সে মনকে সর্ব্বদা নূতন সত্যের, নূতন আলোকের জন্য উন্মুক্ত (receptive) রাখিতে পারে না। যেরূপ ভাবিতে, যেরূপ বিচার করিতে, বহু কাল অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাকেই চরম সত্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকে। তাহার জ্ঞানের বাহিরে যে সকল সত্য আছে, তাহা অনুসন্ধান করা দূরে থাক, সম্ভব বলিয়াও মনে করে না। যদি কোনও বৈজ্ঞানিককে বলা যায়, এক ব্যক্তি বিনা অবলম্বনে ভূমি হইতে ১৫ হাত উচ্চে উঠিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলিবেন বা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কারণ, তিনি কেবল মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই জানেন এবং এই নিয়মের বাহিরে যে কিছু সত্য আছে বা থাকিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেই পারেন না। অর্থাৎ তিনি গোঁড়ামির একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া,

বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামি।

নূতন বা গুহ্য সত্যকে আর মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি কখনই এরূপ করিবেন না। একটা ঘটনা তাঁহার নিকট যতই নূতন, অলৌকিক বা অসম্ভব হউক না কেন, তিনি কখনই তাহা উড়াইয়া দিবেন না। তিনি ধীরচিত্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, তন্ন তন্ন করিয়া, তাহা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবেন, স্থিরভাবে চিন্তা ও বিচার করিবেন এবং যত দিন প্রকৃত কারণে উপনীত না হন, তত দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না, তত দিন সে সম্বন্ধে কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা (final opinion) দিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মদাতা লর্ড বেকন (Lord Bacon) তাঁহার এড্‌ভান্সমেণ্ট অব লার্নিং (Advancement of Learning)-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সকলকেই তাহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

**কবচ ধারণ।**

এখন কবচ ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে উপকার পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, ইহা একটি প্রকৃত ঘটনা (fact)। সুতরাং এই ঘটনাটি কুসংস্কার বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, দেখা যাক ইহার কোনও যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা (rational explanation) পাওয়া যায় কিনা? অনেক দিব্যদর্শী মহাত্মা (clairvoyants) এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অনুসন্ধান ফল নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

**রোগোৎপত্তির কারণ।**

প্রথম দেখা যাক, অসুস্থ দেহ কাহাকে বলে? কি হইলে দেহ অসুস্থ হয়? আমরা অসুস্থতার মোটামুটি দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। ১ম অভ্যন্তর কারণ বা দেহ-যন্ত্রাদির স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমতা, ২য়

আগন্তুজ কারণ অর্থাৎ বহির্দেশ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রভৃতি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া। যদি শরীরের যন্ত্রগুলি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য (যেমন যকৃৎ পিত্তনিঃসারণ কার্য্য, হৃৎপিণ্ড রক্তসঞ্চালন কার্য্য, কিড্‌নি মূত্রনির্ম্মাণ-কার্য্য, অন্ত্র মলনির্গমন-কার্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি) সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে দেহের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, দূষিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হইয়া, দেহটি রোগগ্রস্ত করে। আবার এরূপও হইতে পারে, যে যন্ত্রগুলি স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য ঠিক করিয়া যাইতেছে, অথচ বহির্ভাগ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ (যেমন কলেরা, বসন্ত, সান্নিপাতিক জ্বর, প্লেগ প্রভৃতির বীজাণু) হঠাৎ দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রোগ আনয়ন করিল এবং সব যন্ত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া দিল, তাহাদিগকে অবাধ কর্ত্তব্য-পালনে অপারগ করিয়া ফেলিল।

রোগ নিবারণের উপায়।

অসুস্থ দেহকে সুস্থ করিবার উপায় কি? দূষিত পদার্থ গুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া এবং যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা। দূষিত পদার্থকে বাহির করিলেও যতক্ষণ যন্ত্রগুলি ঠিক কার্য্যক্ষম না হয়, ততক্ষণ দেহ সুস্থ হয় না, পুনরায় রোগ হইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রগুলিকে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, তাহা হইলে দূষিত পদার্থ অনেক সময় আপনা আপনিই বহির্গত হইয়া যায়। এই জন্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, বিরেচক, বমনকারক, স্বেদকারক, মূত্রকারক প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ ততই কমিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনাই রোগ নিবারণের প্রধান ও বোধ হয়, একমাত্র উপায়।

যন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে, বুঝিতে হইবে,

স্নায়ুশক্তি।

ইহারা কোন্ শক্তিতে কার্য্য করে? সে শক্তি কোথা হইতে আইসে? কি কি কারণে সে শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়? সে শক্তিকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিবার উপায় কি? আধুনিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র বলেন স্নায়ুশক্তি (nerve power) দ্বারাই যন্ত্রগুলি স্ব স্ব কার্য্য করে। কিন্তু এই স্নায়ুশক্তি আইসে কোথা হইতে? বিজ্ঞান নীরব।

সূক্ষ্মদর্শীরা (occultists) বলেন, আমাদের স্থূল দেহের মধ্যে ঠিক ইহার অনুরূপ একটি ইথারের দেহ (Etheric double) আছে।

প্রাণশক্তির ক্রিয়া।

শাস্ত্রে ইহারই নাম প্রাণময় কোষ। এই কোষে একটি শক্তি অনবরত ক্রিয়া করিতেছে। এই শক্তির নাম প্রাণ। এই শক্তিই স্নায়ুপথ দিয়া স্থূল দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া, স্থূলদেহকে সজীব ও কার্য্যক্ষম রাখিয়াছে। এই প্রাণশক্তি দ্বারাই যকৃৎ, অন্ত্র, হৃদয়াদি স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে। এই শক্তির একটি নিয়মিত বেগ বা স্পন্দন আছে। যতক্ষণ প্রাণ নিয়মিত রূপে স্পন্দিত হয়, ততক্ষণই যন্ত্রাদি স্ব স্ব কার্য্য যথাযথ পালন করিতে পারে। ইহারই নাম সুস্থাবস্থা। কিন্তু যদি কোন কারণে এই স্পন্দনের ব্যতিক্রম হয়, প্রাণের বেগ কমিয়া বা বাড়িয়া যায়, অমনি যন্ত্রগুলি বিকৃত হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল এরূপ থাকিলে, কোন না কোন পীড়া প্রকাশ পায়। শরীরে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করিলে রোগ উৎপন্ন হয় কেন? বিষাক্ত বস্তুটি প্রাণময় কোষে একটি বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল স্পন্দন উৎপাদন করে। তখন প্রাণের সহিত এই স্পন্দনের একটা সংগ্রাম বাধে। এই সংগ্রামে যদি প্রাণ জয়ী হয় তবেই মঙ্গল, বিষাক্ত বস্তুটাকে নির্বীর্য্য করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। আর যদি বিষের জয় হয়, তাহা হইলে উহা

প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দনকে রুদ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সুতরাং যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, দেহের মৃত্যু ঘটে।

উদাহরণ— হোমিওপ্যাথি।

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব যখন প্রাণের নিয়মিত স্পন্দনটি ঠিক জানিতে পারিবে এবং ইচ্ছামাত্র নিজের বা অপরের দেহে ঐ স্পন্দনটি সঞ্চারিত করিতে পারিবে, তখন্ আর কাহাকেও রোগে ভুগিতে হইবে না। চিকিৎসাটা আর কিছুই নহে, প্রাণের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করা, স্বাভাবিক পথে আনা। সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রই জ্ঞান পূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক ঠিক তাহাই করিতেছে—বিকৃত স্পন্দনকে সাম্যাবস্থায় আনিতেছে। মনে করুন, হোমিওপ্যাথিক ১০০০ ক্রমের এক ফোঁটা ঔষধে একটি রোগ আরাম হইল। এই ফোঁটাটিতে ঔষধ কিছু আছে কি? কিছুই না। তবে আছে কি? যাহা দরকার তাহাই আছে, আছে শক্তি, আছে স্পন্দন, উহার মধ্যস্থ ইথারের তীব্র ও বেগবান স্পন্দন। এই স্পন্দনই প্রাণময় কোষের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করিল, স্বাভাবিক অবস্থায় আনিল, সুতরাং রোগ সারিয়া গেল। শুনা যায় ডাক্তার স্যাল্‌জার একটি রোগীকে দেখিতে গিয়া দেখিলেন, রোগী অচেতন ও নিস্পন্দ, ঔষধ খাইবার শক্তি নাই। তখন ডাক্তার তাঁহার রুমালে কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া, ঐ রুমাল রোগীর নাকের কাছে নাড়িতে লাগিলেন। ইহাতেই রোগীর চেতনা হইল, তিনি অনেক সুস্থ হইলেন। আবার দেখা গিয়াছে, কোন একটা পাতা বা শিকড়ের ঘ্রাণ লইয়া অনেকে পালাজ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি যখন কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়িয়াছিল, অনেক ডাক্তার ইগ্‌নেসিয়া ফল ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, "এই ফল ধারণ করিলে প্লেগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিতে

পারে না, অথবা হতবীর্য্য হইয়া যায়"। এই সকল ঘটনা হইতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদন করিয়াই ঔষধাদি রোগ নিবারণে সমর্থ হয়?

তাড়িত চিকিৎসা ও ক্রোমোপ্যাথি।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "উহা দ্রব্যগুণ বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। ইথারের স্পন্দনে যে এইরূপ ঘটে তাহার প্রমাণ কি?" বলি, দ্রব্য কোথায় যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে? পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা দ্রব্যের একটি পরমাণুও শরীরে প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। কিন্তু রোগ যে আরাম হয়, তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, আরও কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আজ কাল যে স্থানে স্থানে তাড়িত-চিকিৎসা (Electric treatment) প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। রোগীর শরীরের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া রোগ আরাম করা হয়। তড়িৎ-শক্তিটা কি? উহা কি কেবল ইথারের একটি বিশিষ্ট স্পন্দনমাত্র নহে? আবার, আর এক রকম চিকিৎসা আছে, তাহার শক্তিও বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার নাম ক্রোমোপ্যাথি (Chromopathy) বা বর্ণ-চিকিৎসা। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের কাচের শিশিতে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া, ঐ শিশি গুলি ১।১ দিন রৌদ্রে রাখিতে হয়। এই জলই ঔষধ। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন শিশির জল রোগীকে খাওয়াইতে হয়। ইহাতেই রোগ সারিয়া যায়। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে ভিন্ন ভিন্ন শিশিতে ইথারের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন সঞ্চিত করা হইয়াছে লাল কাচের ভিতর দিয়া যেরূপ স্পন্দন আসিয়াছে, নীল কাচের ভিতর দিয়া সেরূপ আইসে নাই। এই জন্যই বিভিন্ন জলের বিভিন্ন গুণ; কোনটি জ্বরে, কোনটি উদরাময়ে কোনটি বা সর্দ্দিকাসিতে প্রযোজ্য। রোগী

মস্তকের যন্ত্রণায় অস্থির, মস্তকে নীল বর্ণ কাচের মধ্য দিয়া নীল আলোক প্রদত্ত হইল। কয়েক মিনিট মধ্যে সে যন্ত্রণা গেল, রোগী ঘুমাইল; নীল আলোকের এ শক্তিকে ইথার-স্পন্দন বই কি বলিব?

মেস্‌মেরিক চিকিৎসক ও জলপড়া।

অতএব, প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদিত করিলেই রোগ সারিয়া যায়। যাঁহার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। ততদূর কষ্ট যদি না করেন, তাহা হইলে যেন ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক মেস্‌মেরিক চিকিৎসার (Curative mesmerismএর) বৃত্তান্ত গুলি এক বার পাঠ করেন। ডাক্তার রোগীকে কোন ঔষধ খাইতে দেন না, এমন কি স্পর্শও করেন না। তিনি রোগীর নিকট বসেন, কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, অথবা রোগীর উপর শূন্যে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন (Pass) করেন। ইহাতেই রোগ সারিয়া যায়। এইরূপ অদ্ভুত আরোগ্যের সহস্র সহস্র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং শত শত ব্যক্তি এই চিকিৎসায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ দেশেও এরূপ চিকিৎসকের অপ্রতুল নাই। ইহারা বলেন, চিকিৎসক তাঁহার নিজ দেহের উত্তম তড়িৎ (good animal magnetism) রোগীর দেহে সঞ্চালিত করিয়া, রোগ আরাম করেন। বস্তুতঃ দেখা যায় এরূপ চিকিৎসার পর, চিকিৎসক একটু দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। ইহার কারণ এই, যে তাঁহার নিজের প্রাণময় কোষ হইতে কতকটা অনুকূল শক্তি (প্রাণ) রোগীদেহে সঞ্চারিত করিয়া দেন। ইহাতে রোগীর প্রাণময় কোষে অনুকূল স্পন্দন উৎপাদিত হওয়ায় রোগী সুস্থ হন বটে, কিন্তু চিকিৎসক ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদ বোধ করেন। জল একটি উত্তম স্পন্দন বাহন, অর্থাৎ স্পন্দন ধারণ করিয়া রাখিবার জলের একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। এইজন্য এই সকল

চিকিৎসক অনেক সময় জল শক্তিযুক্ত ( magnetised ) করিয়া রোগীকে খাইতে দেন। ইহাতেই রোগ আরাম হয়। যাঁহারা আমাদের দেশের "জল-পড়ায়" বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এখন কি বলিবেন ? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শত শত পরীক্ষার ফলকে উড়াইয়া দিবেন কি ? অথবা, এটা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিবেন ?

**কবচ কাহাকে বলে।**

যদি স্বীকারই করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি জলে শক্তি-সঞ্চার করা সম্ভব হয় তবে, যে কোন উপযুক্ত বস্তুতে, ( যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তরাদিতে ) ইহা করা সম্ভব নয় কেন ? যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, কিরূপে শক্তি সঞ্চার করিতে হয় জানেন, এবং কিরূপ স্পন্দন কোন্ রোগের প্রতিষেধক অবগত আছেন, তাঁহারা কি উপযুক্ত বস্তু ( good vehicles ) বাছিয়া লইতে পারেন না ? অথবা ঐ সকল পদার্থে ইচ্ছামত শক্তি সঞ্চার করিতে অপারগ ? তাহাই যদি হয়, তবে কবচ আর কাহাকে বলে ? কোনও ধাতু বা প্রস্তর বা কোনও উপযুক্ত বস্তুতে যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ( বা মহাপুরুষ ) এরূপ একটি বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন যে উহার স্পন্দন, ধারয়িতার দেহের বা মনের বিকৃত স্পন্দনকে নিয়মিত করে, সেই ধাতু বা প্রস্তরকেই কবচ বলে। তবে, কবচ অসম্ভব কিসে ?

**মনের উপরও কবচ ক্রিয়া করে।**

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কবচের দ্বারা আমাদের স্থূল দেহের রোগ নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাই কবচের একমাত্র কার্য্য নহে। মনের উপরও ইহা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিরূপে ইহা ঘটে বুঝিতে গেলে মনটি কি বস্তু এবং কবচের সহিত ইহার

সম্বন্ধই বা কি? আগে বুঝা প্রয়োজন। অতএব, সূক্ষ্ম জগৎ ও সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলিব।

ক্ষিতিতত্ত্ব ও স্থূলদেহ।

আমরা সাধারণতঃ পদার্থের তিনটি মাত্র অবস্থা জানি,—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। কঠিন অপেক্ষা তরল সূক্ষ্ম এবং তরল অপেক্ষা বাষ্প সূক্ষ্ম। (এক খণ্ড স্বর্ণকে উত্তাপ দ্বারা তরল করিলে, উহা লঘু ও পাতলা হয় এবং আরও তাপ দিয়া ঐ তরল স্বর্ণকে বাষ্প করিতে পারিলে উহা আরও লঘু ও সূক্ষ্ম হয়। সেই অবধি আমরা জানি।) কিন্তু বাষ্প অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বীকার করেন। এই সূক্ষ্ম পদার্থের নাম ইথার। ইথারের চারিটি শ্রেণী আছে। ইহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। প্রথম শ্রেণীর ইথার অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় এবং তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ সূক্ষ্মতর। অতএব আমরা সাতটি পদার্থ (বা পদার্থের সাতটি অবস্থা) পাইলাম। কঠিন, তরল, বাষ্প এবং চারি প্রকার ইথার। এই সাতটি পদার্থের নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত তাহার নাম ভূলোক (Physical plane)। আবার ক্ষিতিতত্ত্বের নির্ম্মিত আমাদের এক একটি দেহ আছে। ইহার নাম স্থূল দেহ। স্থূলদেহের দুইটি কোষ আছে,— অন্নময় ও প্রাণময়। অন্নময় কোষটি কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থে নির্ম্মিত। প্রাণময় কোষটি অন্নময় কোষের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। এই প্রাণময় কোষে প্রাণশক্তি নিয়ত স্পন্দিত থাকিয়া স্থূলদেহকে সজীব রাখিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পূর্ব্বে যে সূক্ষ্মতম (৪নং) ইথারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই যে শেষ তাহা নহে। উহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম এক প্রকার

অপ্‌তত্ত্ব ও ভুবর্লোক।

পদার্থ আছে। এই পদার্থের নাম অপ্‌তত্ত্ব। ইথার যেমন ইট, কাঠ, সোনা, লোহা, প্রভৃতি সকল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব (তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বলিয়া) ইথারের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অপ্‌তত্ত্বের-ও সাতটি শ্রেণী আছে,—একটি অপেক্ষা আর একটি সূক্ষ্ম। এই অপ্‌তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত একটি জগৎ আছে। ইহার নাম ভুবর্লোক (Astral plane)। এই লোকেও নানাবিধ জীব বাস করে। ইহাদের দেহও অবশ্য অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। তাহ'লে ভুবর্লোকটি আছে কোথায়? ভুবর্লোক ভূলোকের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট, পৃথিবীর মধ্যেই (এবং কতক বাহিরেও) পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। হয়ত আমাদের ঘরের মধ্যেই কত ভূত প্রেত বেড়াইতেছে, হয়ত আমাদের দেহের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথচ আমরা জানিতে পারিতেছি না।

আবার, এই অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণ সূক্ষ্ম ও লঘু আর এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহার নাম তেজস্তত্ত্ব। ইহার দ্বারা নির্ম্মিত

তেজস্তত্ত্ব ও স্বর্লোক।

একটি জগৎ আছে। তাহার নাম স্বর্লোক বা স্বর্গ। স্বর্গ ভুবর্লোকের মধ্যে (এবং বাহিরেও) পরিব্যাপ্ত এবং এখানেও অসংখ্য জীবের বাস। এইরূপে মহঃ, জন প্রভৃতি উচ্চতর লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত এবং একটির মধ্যে আর একটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেই জীবের বাস আছে। তবে এই সকল জীব মানবের চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক শ্রেষ্ঠ। আদিত্য, বসু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুক্তপুরুষ, ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং ইন্দ্র, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতি লোকপালগণ এই সকল উচ্চতর লোকে বিরাজমান।

সে কথা যাক্। এখন, আমাদের দেহের কথা বলি। এই অপ্‌তত্ত্বে ও তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত আমাদের প্রত্যেকের এক একটি দেহ আছে। এই দেহের নাম সূক্ষ্মদেহ। ইহা ডিম্বাকার (oval) এবং স্থূল দেহ অপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং ইহা স্থূল দেহের ভিতরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া বাহিরেও কিছুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সূক্ষ্মদেহের নামই মন। সুতরাং মন একটা পদার্থ, একটি শরীর। এই জন্যই ইহার নাম মনোময় কোষ। মৃত্যুর পর, মানব এই সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়াই প্রথমে ভুবর্লোকে, পরে স্বর্গে গমন করে। জীবিতাবস্থায় সাধারণ মানবগণ স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহটি আলাদা বা পৃথক করিতে পারে না। কিন্তু যোগী ও সাধকেরা তাহা পারেন। সুতরাং ইচ্ছামাত্র তাঁহারা স্থূল-দেহটি ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে বিচরণ করিয়া আসিতে পারেন। এই সময় তাঁহাদের স্থূলদেহ জড় ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনই চিন্তা।

এই যে আমাদের সূক্ষ্মদেহ, এটি সর্ব্বদা নানাভাবে, নানাপ্রকারে স্পন্দিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর উপর নির্ভর করে। এক একটি স্পন্দনই এক একটি চিন্তা—এক একটি বাসনা। এক প্রকার স্পন্দনের নাম ক্রোধ, আর এক প্রকার স্পন্দনের নাম লোভ, তৃতীয় প্রকার স্পন্দনের নাম স্নেহ ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ স্পন্দনই বিশেষ বিশেষ ভাব—বিশেষ বিশেষ চিন্তা। যদি কোনও স্পন্দনই না থাকে, কোনও ভাব বা চিন্তা থাকিবে না। আবার, যদি এক প্রকার স্পন্দনকে আর এক প্রকার স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। আমার ক্রোধ হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নয়, আমার সূক্ষ্মদেহটি একটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত হইতেছে। যদি এই স্পন্দনটিকে কেহ থামাইয়া দেয়, তাহা

হইলে রাগও থামিয়া যাইবে। অথবা যদি কেহ ইহাতে দয়ার স্পন্দন স্পন্দন উৎপাদন করিয়া দেন, তাহা হইলে ক্রোধের স্থানে দয়ার উদ্রেক হইবে।

অতএব বুঝা গেল আমাদের সূক্ষ্মদেহ নিয়তই স্পন্দিত হইতেছে। তাহার ফলে—ক্রোধ, হিংসা, দয়া, ভক্তি, যুক্তি, কল্পনা প্রভৃতি নানা-প্রকার ভাবে ইহা আলোড়িত হইতেছে। এই স্পন্দন গুলি যে কেবল সূক্ষ্মদেহে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে। যেমন জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ঐ স্পন্দন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন ভুবর্লোকের বায়ুমণ্ডলে (atmosphere)এ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এবং অপরের সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতেছে। মানব! এইবার তোমার কঠিন দায়িত্ব একবার ভাবিয়া দেখ! তুমি ভাব মনোমধ্যে কোনও পাপচিন্তা পোষণ করিলে অপরের অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ দেখ, তোমার সূক্ষ্মদেহ হইতে ক্রোধের স্পন্দন কি বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভুবর্লোকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ঐ দেখ উহা শত শত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া তাহাদের মনেও ক্রোধ জাগাইয়া দিতেছে। আহা! দেখ, দেখ, উহা কি সর্ব্বনাশই সাধন করিল! বেলা দ্বিপ্রহরে ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ক্ষুৎপিপাসাকাতর কৃষক, পত্নীর নিকট অন্ন চাহিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত হইতেছিল। এমন সময় তোমার ক্রোধের প্রচণ্ড স্পন্দন বেচারীর সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিল। হতভাগ্য ক্রোধে জ্ঞান শূন্য হইয়া হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা পত্নীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিল! এখন ভাবিয়া দেখ, নারীহত্যা করিল কে? কৃষক না তুমি?

মানবের দায়িত্ব।

এইরূপে আমরা সূক্ষ্মদেহ হইতে ক্রমাগত ভাল বা মন্দ স্পন্দন চারিদিকে ছড়াইতেছি এবং অলক্ষ্যে মানবের মঙ্গল বা অনিষ্ট সাধন

সংসর্গ সহস্ত।

করিতেছি। ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না। কিন্তু জানিলেও, ইহার ক্রিয়া অব্যর্থ,—অকাট্য। কারণ, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যেরূপ বল সেইরূপ ফল ( change of motion is proportional to the force )। জড়শক্তির যে নিয়ম, সূক্ষ্ম শক্তিরও সেই নিয়ম। কোনও স্থানে জল আলোড়িত হইলে, যেমন তাহার পার্শ্বস্থ বা নিকটবর্ত্তী স্থানেই সমধিক বেগ দৃষ্ট হয় এবং যতই দূরে যাওয়া যায়, বেগ ততই মন্দীভূত হইতে থাকে, ঠিক সেইরূপ স্পন্দনশীল-সূক্ষ্মদেহের নিকটে যত বেগ দূরে তত নহে। এইজন্য সাধু বা অসাধু ব্যক্তির নিকটে থাকিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, দূরে থাকিলে ততটা পাওয়া যায় না। সকল ধর্ম্মই, এই কারণে, সহবাস সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দেন। “সর্ব্বদা সাধু সহবাস করিবে, অসাধু ব্যক্তির সহিত একত্র বাস করিবে না” এইরূপ বিধি নিষেধ সকল দেশেই আছে। সাধু ও মহাপুরুষদিগের সূক্ষ্মদেহ হইতে নিয়ত যে প্রেম, দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির স্পন্দন উত্থিত হয় তদ্দ্বারা তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ সূক্ষ্মাকাশ পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যদি সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট বাস করি, অলক্ষ্যে আমাদের অপবিত্র স্পন্দনগুলি প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়, পবিত্রভাব ও পবিত্র চিন্তা উদ্দীপিত হয়। অসাধু ও দুষ্ট ব্যক্তিদিগের সহবাসে ঠিক বিপরীত ঘটে, তাহাদের কাম ক্রোধাদির অপবিত্র স্পন্দনে আমাদের সূক্ষ্মদেহে ঐ সকল প্রবৃত্তি সবল ও পরিপুষ্ট হয়।

আর একটি কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। স্থূল স্পন্দন যত শীঘ্র থামিয়া যায়, সূক্ষ্ম স্পন্দন তত শীঘ্র থামে না, দীর্ঘকাল ধরিয়া

সূক্ষ্মস্পন্দন চিরস্থায়ী।

চলিতে থাকে। একটা পাত্রে খানিকটা জল লইয়া পাত্রটা নাড়িয়া দাও। প্রথমে, অবশ্য, পাত্রটা

নড়িবে, জলও নড়িবে। একটু পরেই পাত্রটা থামিয়া যাইবে, কিন্তু জল তখনও নড়িতে থাকিবে। পাত্রটি থামিবার অনেক পরে জল থামিবে। আবার, যদি বায়ু দেখিতে পাও তো দেখিবে যে জল থামিবার পরেও বায়ুর স্পন্দন চলিতেছে। বায়ু থামিতে অনেক বিলম্ব হইবে। আবার, বায়ু থামিলেও, ইথার থামে নাই, ইথারের স্পন্দন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী। হয়ত ১০।১২ দিন ( কিম্বা আরও অধিককাল ) ইথারের স্পন্দন চলিবে। এইরূপে অপ্‌তত্ত্বের স্পন্দন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী, হয়ত কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিবে, তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন হয়ত কয়েক যুগ চলিবে এবং আকাশতত্ত্বের স্পন্দন চিরস্থায়ী। এই জন্যই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যত স্পন্দন ( চিন্তা, ভাব, বা কার্য্য ) হইয়াছে, সমস্তই আকাশে চলিতেছে।

দেবালয় পবিত্র কেন?

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনে সন্নিহিত সূক্ষ্মাকাশ ( Astral atmosphere ) স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনটি স্থূল পদার্থের হইলে শীঘ্রই থামিয়া যাইত। কিন্তু ইহা অপ্‌তত্ত্বের স্পন্দন বলিয়া অনেককাল থাকে। এখন, মনে কর কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে তুমি প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ( ভালই হউক বা মন্দই হউক ) চিন্তা কর। ইহার ফল কি হয়? এই স্থানের সূক্ষ্মাকাশে সেই নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনটি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। কালে উহা এরূপ প্রবল হইতে পারে যে অপর কোনও ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিলেই তাহার চিত্তে ঐ চিন্তা বা ভাবটি উদিত হইবে। এই জন্যই যে গৃহে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা হইয়াছে, যে স্থানে বহুকাল পূজা হইয়া আসিতেছে, সেখানকার সূক্ষ্মাকাশ পবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ থাকে। অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা এই পবিত্রতা কমিয়া যায়, নষ্ট হয়। দেবমন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্ প্রভৃতি এই কারণেই পবিত্র। শত

শত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমবেত ভক্তির স্পন্দনে ঐ স্থান গুলি পবিত্রীকৃত। উহারা একপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র বা ব্যাটারি-স্বরূপ; ভক্তিভাব, পবিত্রতা ও ভগবানে বিশ্বাস জাগাইতে সক্ষম। যাহা জীবের এরূপ কল্যাণ-দায়ক, অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা তাহাকে কলুষিত করা মহা পাপ। এই জন্যই ঐ সকল স্থানে কুভাব ও কুচিন্তা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

আবার, যে গৃহে কেবল বিষয় চিন্তা, কুতর্ক, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদির কথা হয়, তাহার সূক্ষ্মাকাশ অপবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ স্থানে ভগবানে মনোনিবেশ করা বা ভক্তিভাব আনা বড়ই কঠিন। এই জন্য সকলেরই পৃথক পূজাগৃহ থাকা উচিত। ঐ ঘরে ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা, কোন কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেকে বলেন "ভগবানকে ডাকিব, তার আবার স্থানাস্থান বিচার কি? যেখানে সেখানে তাঁহাকে ডাকা যায়। ডাকিতে দোষ নাই"। যেখানে সেখানে ডাকিতে পারিলে ভাল বটে, কিন্তু পারিবে কি? আমার একটি বন্ধুর গল্প বলি শুন। ইনি বেশ ভক্তিমান ও পবিত্রাত্মা। একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য বিদেশে যান। যাঁহার বাড়া গিয়াছিলেন, তিনি খুব বড় লোক। দাসদাসীপূর্ণ সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকায় বন্ধুর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি একটি নির্জ্জন স্থান চাহিলেন। ইহাতে গৃহস্বামী সানন্দে বন্ধুকে স্বীয় বাগান-বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। বন্ধু দেখিলেন এক সুবৃহৎ উদ্যান, এবং মধ্যস্থলে একটি সুন্দর গৃহ, কোন গোলমাল নাই। বন্ধুর খুব আনন্দ হইল, তিনি যাহা চান তাহাই মিলিয়াছে। কিছু রাত্রে, তিনি তাঁহার নিত্য-কার্য্য (উপাসনা) করিতে বসিলেন। কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ হয় না; অনেকক্ষণ

বেশ্যালয়াদি অপবিত্র কেন?

( কয়েক ঘণ্টা ) চেষ্টার পর তিনি বিফল-মনোরথ হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং প্রভাত হইলে সে স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। খুব প্রত্যূষে দেখিলেন বাগানের মালী উঠিয়াছে। বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু এ ঘরে কি হয়? কেহ ছিল কি?" মালীর মুখে যাহা শুনিলেন তাহাতেই সব বুঝিতে, পারিলেন। শুনিলেন সেই ঘরে বাবু মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব, সুরা ও কামিনী লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। সেই ঘরের সূক্ষ্মাকাশ অপবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ ছিল। তাই শত চেষ্টা করিয়াও বন্ধু পবিত্র স্পন্দন আনিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি বেশ্যালয়, শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি অপবিত্র কেন।

অস্পৃশ্য বস্তু ও স্পৃশ্য বস্তু।

আর একটি কথা। আমাদের যেমন এক একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, প্রত্যেক বস্তুরই সেইরূপ ( astral counterpart ) আছে। ইট, কাঠ, সোনা, লোহা, বিছানা, মাদুর, টেবিল, চেয়ার,—সব জিনিষেরই আছে। এখন, যে সকল বস্তু আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি তাহারা আমাদের সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করে, আমাদের স্পন্দনে তাহারাও স্পন্দিত হয়। যে আসনে বসিয়া তুমি নিত্য উপাসনা কর, সেই আসনে একটা শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইতে ভক্তি ও জ্ঞানের স্পন্দন নির্গত হয়। এই জন্যই কোন উচ্চ সাধকের আসনে সাধারণ লোক বসিতে পারে না,—সে তীব্র স্পন্দন সহ্য করিতে পারে না। সেইরূপ, যে পুষ্প দিয়া তুমি দেব পূজা কর, যে মালা দিয়া জপ কর, অথবা যে চেয়ারে বসিয়া মানসিক চিন্তা কর, সেই পুষ্প, মালা ও চেয়ারে অনুরূপ স্পন্দন সঞ্চিত হয়। যে তরবারি বা ছোরার দ্বারা নরহত্যা সাধিত হইয়াছে, তাহা হইতে ক্রোধ ও জিঘাংসার স্পন্দন উত্থিত হয়। যে পরিচ্ছদাদি পরিয়া লম্পট কামিনী সম্ভোগ করে, তাহা কামের স্পন্দন বিকীর্ণ করে। দুষ্ট ও

অসাধু ব্যক্তিগণ যে গৃহে বাস করে, যে শয্যায় শয়ন করে, যে আসনে উপবেশন করে, যে বস্ত্র পরিধান করে, যে পাত্রে আহার করে, সেই সকল পদার্থ কাম, ক্রোধ, লোভ হিংসাদির স্পন্দনে স্পন্দিত থাকে। সুতরাং অপরে তাহা ব্যবহার করিলে ক্ষতিগ্রস্ত বই লাভবান হন না। এই জন্যই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অপরের বস্ত্রাদি পরিধান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে সাধু ও মহাত্মারা যে সকল জিনিষ ব্যবহার করেন তাহাতে পবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত থাকে। এই কারণেই সদ্‌গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ, পাদোদক পান প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এই সকল রহস্য না জানা হেতু আজকাল অনেকেই কুসংস্কার বোধে এগুলিকে ত্যাগ করেন এবং যত্র তত্র পানাহার ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করা পরম উদারতা জ্ঞান করেন।

হিন্দুর জল-পূজা।

হিন্দুর নিকট জল বড়ই পবিত্র। বৈদিক কাল হইতে তাঁহারা জলকে বহু মান্য ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। "শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ"—সমুদ্রের জল, কূপের জল আমাদের মঙ্গল বিধান করুক, "আপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ"—জল আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুক, ইত্যাদি জলের স্তব বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। আধুনিক কালেও দেখা যায়, নদীতে স্নান, নদীর জল পান এমন কি স্পর্শ করিলেও আমরা পাপমুক্ত হই, ইহা শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুকে নিত্য আহ্নিক ক্রিয়ায় এই বলিয়া জল শুদ্ধি করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর জল আমার এই জলে মিলিত হউক, ইহাকে পবিত্র করুক। অবশ্য, সকল জলই হিন্দুর

পূজ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্যা ও পবিত্রা। ইহার কারণ কি? জড়বাদীরা বলিবেন "অপবিত্র জল হইতেই সব রোগের উৎপত্তি। সকল রোগেরই বীজাম্বু (germs) জলে যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেরূপ অন্য কিছুতে নহে। সুতরাং জল বিশুদ্ধ রাখিতে পারিলে, কলেরা, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই জন্যই পবিত্র জলের এরূপ মাহাত্ম্য"। অবশ্য এ কথা, যে মিথ্যা, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু ঋষিরা যে কেবল জড়দেহের জন্যই ব্যাকুল ছিলেন, তাহা নহে। জড়দেহের স্বাস্থ্য অবশ্য তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সূক্ষ্মদেহের স্বাস্থ্য (মনের পবিত্রতা) তাঁহারা সহস্র-গুণে মূল্যবান মনে করিতেন। মন নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে জলের যেরূপ শক্তি, অন্য কোন বস্তুর সেরূপ আছে কি না সন্দেহ।

গঙ্গার মাহাত্ম্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জল একটি উত্তম স্পন্দনবাহন। সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দন, জল সহজেই ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেহ যদি স্নানের সময় পবিত্র চিন্তা করেন, ভক্তিভাবে স্তব ও মন্ত্রাদি পাঠ করেন, দেবপূজা বা ভগবদারাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের পবিত্র স্পন্দন জলে সহজেই সঞ্চিত হইতে থাকে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতবর্ষীয় নদী কূপাদিতে তাঁহাদের নিত্য ক্রিয়া (পূজাদি) করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ঐ জল যে পবিত্র স্পন্দনে পূর্ণ হইয়া আছে ইহা কি বিচিত্র? এ সম্বন্ধে গঙ্গার প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপনাবধি আজ পর্য্যন্ত যাবতীয় দেব কার্য্যে গঙ্গাজল যত ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ আর কোন নদী হয় নাই। যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা,—সমস্তই চিরকাল গঙ্গোপকূলে হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই গঙ্গাজলে পবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা আমাদের

মনে পবিত্র স্পন্দন আনিতে সক্ষম, আমাদের পাপ চিন্তা দূর করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত, গঙ্গা মাহাত্ম্যের আরও কারণ থাকিতে পারে। পুরাণ বর্ণিত ভগীরথোপাখ্যানে একটি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

টাকা পয়সার অপবিত্রতা।

জলের ন্যায়, টাকা, পয়সা ও নোট প্রভৃতিতেও সহস্র ব্যক্তির সমবেত স্পন্দন পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। তবে জলে যেমন সাধারণতঃ পবিত্র স্পন্দন নিহিত, টাকা-কড়িতে সেরূপ নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ বা নীচ বাসনাদির স্পন্দনেই ইহারা স্পন্দিত। আবার যে টাকা বা যে নোট যত অধিক পুরাতন হয়, যত অধিক হাত ফেরা হয়, তাহার অপবিত্রতা ততই বাড়িয়া যায়। পয়সা ও পুরাতন নোট গুলোর অপবিত্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মোহর বা টাকার তত নহে। একজন সূক্ষ্মদর্শী বলেন, ক্ষুদ্র একখণ্ড রেডিয়ম বুক পকেটে রাখিলে উহা যেমন স্থূলদেহে একটা বিষক্রিয়া করে ; খানিক পরে সেখানকার চামড়ায় একটা বিষম দুরারোগ্য ক্ষত উৎপন্ন হয় ; টাকা পয়সা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিলে উহারাও ঠিক সেইরূপে আমাদের সূক্ষ্মদেহের অনিষ্ট করে, উহাদের অপবিত্র স্পন্দনের দ্বারা মনকে অপবিত্র ও কলুষিত করে। বোধ হয়, এই কারণেই আমাদের দেশে অনেক সাধু মহাত্মা টাকা পয়সা স্পর্শ করেন না। আমাদের, অবশ্য, বর্ত্তমান অবস্থায় ততদূর করা সম্ভব নয় ; টাকা কড়ি স্পর্শও করিতে হইবে এবং সঙ্গেও লইয়া যাইতে হইবে। তবে, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ সঙ্গে রাখিব, অন্য সময় রাখিব না, বিশেষতঃ পূজার সময় বা পূজার ঘরে রাখিব না, ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট।

যাঁহারা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, তাঁহারা বলেন বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্পন্দন আছে। কোন কোন বস্তু হইতে স্বভাবতঃ ভাল

পবিত্র দ্রব্য ও অপবিত্র দ্রব্য।

স্পন্দন এবং কোন কোন বস্তু হইতে স্বতঃই মন্দ স্পন্দন নির্গত হয়। বহুমূল্য প্রস্তরাদির (যেমন নীলা, মরকতাদির) স্বাভাবিক স্পন্দন পবিত্র। বৃক্ষের মধ্যেও এইরূপ আছে। কোন কোন গাছ স্বভাবতঃ পবিত্র, এবং কোন কোন গাছ অপবিত্র। তুলসী, বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, নিম্ব প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। রুদ্রাক্ষ হইতে স্বতঃই একটা দৃঢ়তা ও তন্ময়তার স্পন্দন নির্গত হয়। এই জন্যই আমাদের দেশে রুদ্রাক্ষ, তুলসীর মালা প্রভৃতি ধারণ করিবার প্রথা আছে। বিশেষ বিশেষ গন্ধ দ্রব্যেরও বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে। ধূপ, ধুনা, চন্দন ও পুষ্পাদি স্বভাবতঃ পবিত্র স্পন্দনে স্পন্দিত এবং মৃগনাভি প্রভৃতির স্পন্দন অপবিত্র। এই পবিত্রতার মধ্যেও আবার বিভিন্নতা আছে; কোনটি হয়ত একরূপ পবিত্রতার উদ্রেক করে, অন্যটি হয়ত আর এক রকম পবিত্র ভাব জাগায়। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প দিয়া পূজা করিবার বিধি আছে। যে দেবতার যে স্পন্দন অনুকূল (harmonious), সেই দেবতাকেই সেই পুষ্প দিবার ব্যবস্থা। ধুনার ধোঁয়া মনসা দেবীর অসহ্য।

যে বস্তুর যে স্পন্দনটি স্বাভাবিক সেই বস্তুতে যদি সেই জাতীয় স্পন্দন সঞ্চারিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার শক্তি যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয় ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি কবচ প্রস্তুত করিবার সময় ঠিক এইরূপই করিয়া থাকেন। মনে কর, একজন সর্ব্বদাই একটা অকারণ ভয়ে ভীত হয়। তাহাকে একটা অভয় কবচ দেওয়া প্রয়োজন। এস্থলে কবচ-নির্ম্মাতা কি করিবেন? তিনি প্রথমে তাঁহার বস্তুটি (vehicle) নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। যে বস্তু হইতে স্বভাবতঃ দৃঢ়তা ও সাহসের

কবচ প্রস্তুত প্রণালী।

স্পন্দন নির্গত হয়, তিনি সেই বস্তুটি লইয়া স্থিরচিত্তে, একাগ্র মনে, তাঁহার সমগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া, উহাতে সাহসের স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিবেন। ইহা একদিনে না হয়, দুদিন, চারদিন, ক্রমাগত ঐরূপ করিবেন। যখন দেখিবেন উহা খুব শক্তিযুক্ত ( Magnetised ) হইয়াছে, তখন ঐ ব্যক্তিকে উহা ধারণ করিতে দিবেন। যোগী ও মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির যে কত জোর তাহা পরে বলিব। কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কবচ প্রস্তুত করা,—ইহা শক্তিশালী পুরুষ বা যোগীরাই পারেন। অবশ্য, সাধারণ ব্যক্তিও কবচ প্রস্তুত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহাদের প্রণালী অন্যরূপ। তাঁহারা প্রধানতঃ মন্ত্রশক্তি ও দৈবশক্তির সাহায্যে করিয়া থাকেন। এ কথাও পরে বলিব।

এখন, ধারয়িতার উপর কবচ কিরূপে কার্য্য করে দেখা যাক। তাঁহার সূক্ষ্মদেহে যেরূপ স্পন্দন প্রবল, কবচ দিনরাত ঠিক তাহার বিপরীত স্পন্দন উৎপাদন করিতে থাকে। সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটি কমিয়া গিয়া, কবচের স্পন্দনই মনে ক্রমশঃ প্রবল হয়। অবশ্য, কবচে তাঁহার বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, কবচের কথা মনে থাকুক বা নাই থাকুক, কবচের যাহা ক্রিয়া তাহা হইবেই। কিন্তু যদি কবচে তাঁর প্রবল বিশ্বাস হয়, যদি সর্ব্বদাই মনে হয় কবচ আছে, আমার ভয় কি, তাহা হইলে, তাঁহার নিজের ইচ্ছাশক্তি ও কবচের শক্তি সমবেত হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং ফলও অনেক বেশী হইবে। কবচের শক্তির সহিত-বিশ্বাস মিলিত হইলে, কিরূপ অসাধারণ শক্তি জন্মায়, নিম্ন লিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। একটি স্ত্রীলোকের সদাই কেমন একটা ভয় হইত, বিশেষতঃ রাত্রিতে যখন তিনি একা থাকিতেন। তিনি এক মহাপুরুষের নিকট হইতে একটি অভয়-কবচ ধারণ করেন। এই কবচে তাঁহার অটল

কবচের ক্রিয়া।

বিশ্বাস ছিল। একদিন তিনি খুব একটি তেজী ঘোড়া জুতিয়া, গাড়ী নিজে হাঁকাইতে ছিলেন। সহিস পিছনে বসিয়াছিল। গাড়ীখানি বন-পথে যাইতেছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ক্ষেপিয়া গিয়া তীরবেগে বনের মধ্যে ছুটিতে লাগিল। ঘন সন্নিবিষ্ট বড় বড় গাছের মধ্য দিয়া ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে, যদি একটি গাছে ধাক্কা লাগে গাড়ীখানি একেবারে চুর্‌মার হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া সহিস প্রাণভয়ে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু বিষম আহত হইল। কিন্তু রমণীর তৎক্ষণাৎ ঐ কবচের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন, "কবচ যখন আছে, তখন আমার কখনও বিপদ হইতে পারে না।" এই বিশ্বাসে তিনি স্থির ও ধীরভাবে এত দক্ষতার সহিত ঘোড়া চালাইতে লাগিলেন, যে সহজ অবস্থায় সেরূপ কেহ পারে না। তাঁহার শরীর ও মনে একটা অমানুষিক শক্তি আসিল। এইরূপে অনেকক্ষণ দ্রুতগমনের পর ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেলে, তিনি অক্ষত দেহে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন। পরে তিনি মহাপুরুষকে এই ঘটনাটি বলিয়া তাঁহার কবচের খুব সুখ্যাতি করিলে, মহাপুরুষ বলিলেন, "কবচে তোমার অটুট বিশ্বাসই তোমাকে বাঁচাইয়াছে। এই বিশ্বাস বশতঃ তোমার যে মনের বল আসিয়াছিল তাহার সহিত কবচের শক্তি মিলিত হইয়াই এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে।"

**কবচের অন্ত ক্রিয়া।**

কবচ ধারয়িতার যদি খুব বিশ্বাস থাকে, তিনি বিপদের সময় আর এক প্রকারে সাহায্য পাইতে পারেন। যে মহাপুরুষ কবচ প্রস্তুত করিয়া দেন তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের সহিত ঐ কবচের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ( Magnetic tie ) বরাবরই থাকে। এখন, ধারয়িতা যদি খুব বিপদের সময় একমনে ঐ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন, যদি অন্তরের সহিত তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন, তাহা

হইলে মহাপুরুষ তাহা জানিতে পারেন এবং সূক্ষ্মদেহে আসিয়া অথবা সূক্ষ্ম শক্তি প্রেরণ করিয়া ধারয়িতাকে রক্ষা করেন।

আমরা দেখিলাম সূক্ষ্মদর্শী—মহাপুরুষেরাই শক্তি সঞ্চারিত করিতে জানেন; সুতরাং তাঁহারাই কবচাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ। তবে, আমাদের দেশের আচার্য্যগণ যে সকল কবচাদি করিয়া দেন, সেগুলি তো অসার; কারণ, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শীও নন, শক্তিশালীও নন। না—সেগুলিও অসার নহে। কারণ, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নির্দ্দিষ্ট ফল অবশ্যম্ভাবী; ইহা পণ্ডিতই করুন বা মূর্খই করুন। রসায়ন বিজ্ঞান না জানিয়াও কেহ যদি কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট উপাদানগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করেন, তাহা হইলে বারুদ প্রস্তুত হয় না কি? আলোকতত্ত্ব না জানিয়াও শত শত ব্যক্তি ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিতেছেন না কি? সেইরূপ, সূক্ষ্মবিজ্ঞান ( Occult Science ) না জানিয়াও আমাদের আচার্য্যগণ ঋষি কথিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের উপায়গুলি প্রধানতঃ মন্ত্রশক্তি ও দৈবশক্তি।

অজ্ঞ লোকের কবচ।

এখন, মন্ত্র ও দেবতা রহস্য যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।*

মন্ত্র কি?

মন্ত্র কি? ইহা একটি অক্ষর বা কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি। লৌকিকভাবে ইহার কোন অর্থ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিদিগের দ্বারা এই অক্ষরগুলি এরূপে নির্ব্বাচিত এবং পর পর সন্নিবেশিত যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত

*এ সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু অধিক জানিতে চান, তাঁহারা যেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল প্রণীত Philosophy of the gods নামক পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

হইলে তদ্দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে একটি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন উৎপন্ন হয়। একটি মন্ত্রের দ্বারা এক প্রকার স্পন্দন, অন্য মন্ত্রের দ্বারা অন্য প্রকার স্পন্দন উত্থিত হয়। বহুবার (লক্ষ লক্ষ বার বা কোটি কোটি বার) ঠিক নিয়মানুসারে উচ্চারিত হইলে ঐ স্পন্দন এত প্রবল হইতে পারে যে উহা স্থূল দেহের বা সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্ত স্পন্দনকে সম্যক্ পরিবর্ত্তিত কবিয়া দিতে পারে, অথবা স্থূল জগতে বা সূক্ষ্ম জগতে একটি বস্তুকে ভাঙ্গিতে পারে কিম্বা গড়িতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য ক্রমে পরিস্ফুট করিতেছি। তবে, এইটুকু স্মরণ রাখিও যে ইহা একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। ধর্ম্ম বা ভগবানে বিশ্বাসের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। একজন নাস্তিক যেমন উত্তম রাসায়নিক (chemist) বা বাদ্যকর (musician) হইতে পারেন, সেইরূপ তিনি মন্ত্রসিদ্ধও হইতে পারেন।

**স্পন্দন পদার্থকে ভাঙ্গিতে পারে।**

শব্দের দ্বারা যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহার যে কি অসাধারণ শক্তি তাহা আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। একমাত্র শব্দ-স্পন্দনের দ্বারাই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং স্পন্দনের দ্বারাই ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহা শাস্ত্রেরই কথা। ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন বুঝিতে পারিব না, কারণ ইহা অতীব দুরূহ। তবে, আমরা নিত্য যাহা দেখিতে পাই তাহা হইতেই কতকটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পাতলা কাচের একটা গেলাস বা বাটী সম্মুখে রাখিয়া, আমি তাহার নিকট একটা বাদ্যযন্ত্র (বেহালা বা এস্‌রাজ) বাজাইতে লাগিলাম। বেহালার সুরটি তুলিয়া বা নামাইয়া এরূপ একটি সুর পাওয়া যাইবে, যাহার সহিত ঐ কাচের ঠিক ঐক্য হইবে। অর্থাৎ যখন দেখিব আমি যে সুরটি বাজাইতেছি, কাচ হইতেও ঠিক সেই সুরটি নির্গত হইতেছে, তখনই বুঝিব এইবার

কাচের সহিত ঐক্য ( harmony ) হইয়াছে। মনে কর, এই সুরটি আমি ক্রমাগত বাজাইতে লাগিলাম। কি দেখিব? দেখিব ঐ গেলাস হইতে ঐ সুরটি ক্রমশঃ অধিক জোরে বাহির হইতেছে। আমি যদি তখনও বেহালা বাজাইয়া যাই, অবশেষে ঐ গেলাসটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কেন এরূপ হয়? কাচের অনুগুলির স্পন্দনের একটি সীমা আছে। যখন তাহাদের স্পন্দন ঐ সীমা অতিক্রম করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই উহা ভাঙ্গিয়া গেল। এই রহস্যটি জানিয়া ইউরোপের একজন বাদ্যকর সাধারণ লোকের বড়ই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যে কোনও অট্টালিকা ( যতই সুদৃঢ় হউক না কেন ) তিনি বেহালা বাজাইয়া ভূমিসাৎ করিতে পারেন। এবং দু' একটি করিয়াও ছিলেন। ইহাতে লোকে বলিত তাঁহার ভৌতিক শক্তি আছে, তাঁহার অধীনস্থ ভূতেরাই ঐরূপ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে তিনি বেহালায় নানাসুর বাজাইয়া অট্টালিকার সহিত কোন্‌টির ঐক্য হয় আগে তাহা নিরূপণ করিতেন। তারপর সেই সুরটি অনবরত ( দুই তিন দিন ধরিয়া ) বাজাইতে থাকিতেন। ইহাতে, প্রথমে অট্টালিকা হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইত, পরে উহা দুলিতে থাকিত, শেষে ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইত। ঈদৃশ ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্পন্দনের দ্বারা কোন বস্তুকে ভাঙ্গা যাইতে পারে।

আবার, সম্প্রতি আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যে সকল পরীক্ষা ও eidophone আদি যন্ত্রাবিষ্কার হইয়াছে, তদ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে স্পন্দন বস্তুকে ভাঙ্গিতেও পারে, গড়িতেও পারে। একটি বাদ্য যন্ত্রের উপর খুব লঘু পদার্থ ( যেমন লাইকোপোডিয়মের গুঁড়া প্রভৃতি )

স্পন্দনের দ্বারা মূর্ত্তি সৃষ্টি।

ছড়াইয়া দিলে দেখা যায়, যে ঐ যন্ত্রে যখন একটি সুর বা রাগিণী বাজান হয়, তখন ঐ গুঁড়াগুলি কম্পিত হইয়া ঐ বাদ্য যন্ত্রের উপর নাচিতে থাকে এবং শেষে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে। যতক্ষণ ঐ রাগিণীটি বাজিতে থাকে, ততক্ষণ ঐ আকারের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যেমন অন্য এক রাগিণী বাজান হয়, অমনি ঐ আকারটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং গুঁড়াগুলি আর একটি নূতন আকার গ্রহণ করে। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে একটি রাগিণীতে হয়ত একটি ফুলের আকার হইল, অন্য রাগিণীতে হয় ত একটি পাখী সৃষ্ট হইল, তৃতীয় রাগিণী হয়ত একটি পশুর আকার গড়িল, ইত্যাদি। এই সকল পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, যে বিভিন্ন স্পন্দন বিভিন্ন আকার সৃষ্টি করে। শুধু বা তাই কেন? ভাঙ্গিতেও পারে না কি? মনে কর, প্রথমে ফুলের আকারটি সৃষ্ট হইয়াছে। আর একটি রাগিণী বাজাইলে আগে ত ফুলটি ভাঙ্গিবে, তবে নূতন আকার গঠিত হইবে। অতএব, স্পন্দন, ভাঙ্গিতেও পারে গড়িতেও পারে। বহুকাল পূর্ব্বে ঋষিরা আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে বিভিন্ন রাগিণীর বিভিন্ন আকার বা মূর্ত্তি আছে এবং ঐ মূর্ত্তিগুলির বর্ণনাও করিয়া গিয়াছেন, যেমন ভৈরবীর এইরূপ আকার, বেহাগের এইরূপ আকার ইত্যাদি (সঙ্গীত শাস্ত্রে বা শব্দ কল্পদ্রুমে দ্রষ্টব্য)। শিক্ষিত সম্প্রদায় এগুলিকে রূপক বা 'গাঁজাখুরি' বলিয়া উড়াইয়া দেন। আমেরিকায় আবিষ্কৃত এই বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে, বোধ হয় এগুলিকে আর 'গাঁজাখুরি' মনে হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে এক একটি রাগিণী ঠিক আলাপ করিলে সূক্ষ্ম জগতে (অর্থাৎ পার্থিব ইথারে ও বায়ুতে) এক একটি মূর্ত্তি গঠিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহাদের যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিও এরূপে রচিত ও গ্রথিত যে তাহাদের স্পন্দনে ঠিক এরূপ ফল হয়, সূক্ষ্মাকাশে এক একটি মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়। একথা পরে বলিতেছি। আগে দেখা যাক সূক্ষ্মদেহের উপর মন্ত্রের কোন ক্রিয়া আছে কি না? মনে কর, এক ব্যক্তি বড় ক্রোধী, তাঁহার সূক্ষ্মদেহে ক্রোধের স্পন্দনটি সদাই প্রবল। তিনি যদি নিত্য ২।১ ঘণ্টা করিয়া এরূপ একটি মন্ত্র জপ করেন যাহা ধৈর্য্য বা ক্ষমার স্পন্দন উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহা হইলে ফল কি হইবে? ক্রোধের স্পন্দনটি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকিবে, এবং জপের জোর যতই বাড়িবে, ক্রোধ ততই দমিত হইবে। অবশ্য, ইহার সহিত যদি তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি যোগ দেয়, ক্রোধ দমন করিতে যদি তাঁর আন্তরিক চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ফল আরও শীঘ্র পাইবেন নিশ্চিত। কেবল ইচ্ছা-শক্তি দ্বারাও ক্রোধাদি দমন করা যায়, অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রের সাহায্য লইলে কাজটি সহজে হয়। এইরূপে বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা চিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে দমন করা যাইতে পারে। কোন মন্ত্রের দ্বারা বৈরাগ্য আসিতে পারে, কোন মন্ত্রের সাহায্যে প্রেমের উদয় হইতে পারে, আবার কোন মন্ত্র হিংসা-রাক্ষসীকেও জাগাইয়া দিতে পারে। ডামর ও উড্ডীশাদি তন্ত্রে মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভনাদির যে সকল মন্ত্র আছে, তাহারা এই জঘন্য শ্রেণীর। আবার মন্ত্রের স্পন্দন প্রাণময় কোষের উপরেও কার্য্য করিয়া নানাবিধ পীড়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু মনে রাখিও মন্ত্রের ফল লাভ করিতে অসাধারণ ধৈর্য্য, একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ইহা অনেকের নাই বলিয়া ফলও পান না।

মন্ত্রের শক্তি।

আবার, মন্ত্রের দ্বারা অপরের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনকে পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত করা যায়। তুমি যদি এক ব্যক্তির উদ্দেশে বা তাঁহার অজ্ঞাদি

মন্ত্র সাহায্যে কবচ নির্ম্মাণ।

স্পর্শ করিয়া কোন মন্ত্র একাগ্রভাবে জপ কর, তাহা হইলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইতে পারে। কিন্তু যদি কোন উপযুক্ত পদার্থে (যেমন অশ্বত্থ পত্র, বটপত্র, ভূর্জ্জপত্র বা প্রস্তরাদিতে) মন্ত্রের স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া, উহা ঐ ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দাও, তাহা হইলে ফল আরও শীঘ্র পাওয়া যায়। আমাদের আচার্য্যেরা প্রায় এই প্রকারে কবচাদি প্রস্তুত করেন। অবশ্য, ইহার আনুষঙ্গিক অনেক ক্রিয়া আছে, যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট তিথি নক্ষত্রাদিতে ইহা করিতে হয়, এবং দেবতার হোম পূজাদি করিতে হয়। ইহার মধ্যেও অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রাদি, পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর অনুক্ষণ একটা প্রভাব (influence) বিস্তার করিতেছে। কিন্তু গ্রহাদির বিশেষ বিশেষ অবস্থান অনুসারে এই প্রভাবের তারতম্য হয়। একপ্রকারে অবস্থিত হইলে অনুকূল স্পন্দন, অন্য প্রকারে অবস্থিত হইলে প্রতিকূল স্পন্দন প্রদান করে। এইজন্য কোন ব্যক্তির কবচ প্রস্তুত করিবার সময় দেখিতে হয় কোন্ দিনে বা কোন্ সময়ে গ্রহাদির প্রভাব (তাঁহার উপর এবং নির্ব্বাচিত পদার্থটির উপর) সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। ইহা ব্যতীত দৈব শক্তির সাহায্য লইলে আরও উত্তম হয়।

দৈব শক্তিটা কি? দেবতা কাহাকে বলে? দেবতা শব্দে ঈশ্বর বা ভগবানকে বুঝায় না। হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বীকার করেন বলিয়া কেহ যেন না ভাবেন, হিন্দু বহু ঈশ্বর-বাদী।

দেবতা কি?

তবে দেবতারা কি? দেবতারা জীব। আমরা যেমন ভগবানের সৃষ্ট জীব, তাঁহারাও সেইরূপ। তবে, জ্ঞানে, প্রেমে বা শক্তিতে তাঁহারা সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে ভগবানের মূর্ত্তিমান শক্তি বলা যাইতে পারে।

আমরা যেমন স্থূলদেহে ভূলোকে বাস করি, তাঁহারা এরূপ করেন না। ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মতর লোকেই তাঁহাদের বাসস্থান; এই সকল লোকেই তাঁহারা তত্তৎ লোকের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহে বাস করেন।

আমরা পৃথিবীতেই দেখিতে পাই, সকল জীব সমান নহে, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ উৎকৃষ্ট। উদ্ভিদ অপেক্ষা পশু পক্ষী শ্রেষ্ঠ, পশু পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। আবার সব পশু পক্ষী সমান নহে; ইহাদের মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে, কেহ কম উন্নত, কেহ বেশী উন্নত। সেইরূপ মানুষের মধ্যেও আছে। অসভ্য উলঙ্গ মানুষের সহিত একজন সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের তুলনাই হয় না। আবার, সাধারণ সভ্য মানুষের চেয়ে ঋষি মহাত্মারা অনেক উন্নত। এখন কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি শাস্ত্র, সকলেই একবাক্যে বলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি ক্রমোন্নতির নিয়ম (Law of Evolution) আছে। এই নিয়ম অনুসারে নিম্নতর জীব ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে পরিণত হয়। ভগবানের অখণ্ড নিয়মেই খনিজ পদার্থ (minerals) ক্রমোন্নত হইয়া উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ পশুপক্ষীতে এবং পশুপক্ষী মানুষে পরিণত হইয়াছে। ভাল, এই ক্রমোন্নতি শৃঙ্খল কি মানুষে আসিয়াই শেষ হইয়াছে? মানুষের উপরে কি আরও উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর জীব নাই? ইহা অস্বাভাবিক, ইহা অসম্ভব। কারণ, ভগবান একটি অতি প্রকাণ্ড বস্তু, অতি বৃহৎ। মানবের মধ্যে তাঁহার অনন্ত ব্যবধান। মানব ক্রমোন্নত হইয়া ঈশ্বরে পরিণত হইবে অন্ততঃ ঈশ্বরের নিকটস্থ হইবে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানব এক লম্ফে এই অনন্ত ব্যবধান অতিক্রম করিবে ইহা কি সম্ভব? আমরা দেখিতেছি, জীব ক্রমশঃ উন্নত হয়, তিল তিল করিয়া বাড়ে। একটি

জীবের ক্রমোন্নতি।

বৃক্ষ এক লম্ফে একটি সাধু বা মহাপুরুষ হয় নাই; তাহাকে মধ্যবর্ত্তী অনেক অবস্থা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সেইরূপ ঈশ্বরে পৌঁছিতে হইলে মানবকেও অসংখ্য উচ্চ অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হইবে। অতএব মানবের উপরে অনেক উচ্চতর জীব আছেন, ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় কি? এই উচ্চতর জীবগণই সাধারণতঃ দেবতা নামে অভিহিত।

ইহা হইতেই অনেকের মনে হইতে পারে, সকল দেবতাই মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা মনুষ্য জাতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহা নহে।

**দেব-শৃঙ্খল ও মানব-শৃঙ্খল।**

মানুষের যেমন একটি ক্রমোন্নতি শৃঙ্খল (খনিজ হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে উচ্চতর জীব) আছে, সেইরূপ দেবতাদিগেরও একটি পৃথক্ ক্রমোন্নতি মার্গ আছে। তাঁহারাও সেই মার্গেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন, মানুষেরাও নিজের পথে উঠিতেছে। এই দুই মার্গের মধ্যে বড় একটা সম্বন্ধ নাই। তবে মানুষ যখন উন্নত হন, ঋষি বা অতি মানুষের অবস্থা পান, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে, দেবতাদিগের শৃঙ্খলেও প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা মানুষের অন্যতম পথ। সকল মানুষকেই যে দেবতা হইতেই হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা দেবযান আশ্রয় করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকায়াদি দেহ ধারণ করিয়া উচ্চতর লোকে (তপঃ, সত্য আদি লোকে) বাস করেন এবং ক্রম মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের সহিত পৃথিবীর বা মানবের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু যাঁহারা ত্যাগমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা নির্ম্মাণ-কায়া গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জাতির উদ্ধারের জন্য পৃথিবীর সীমার মধ্যেই অবস্থান করেন।*

---

* এই সকল রহস্য, আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র" নামক পুস্তকে সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সকলকেই উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অতএব দেখা গেল, দেবতারা পৃথক্ জীব, তাঁহাদের পৃথক ক্রমোন্নতি মার্গ আছে। কাজেই সকল দেবতা সমান উন্নত নহেন; ইঁহাদিগের নানা শ্রেণী, নানা বিভাগ আছে। যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, গুহ্যক, বিদ্যাধর—এইগুলি নিম্নস্তরের দেবতা। ইঁহাদিগকে দেবযোনি বলে। ইঁহারা ভুবর্লোকে বাস করেন। ইঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে যে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। তবে সূক্ষ্ম জগৎ ইঁহাদের স্বাভাবিক বাসস্থান (Natural element) বলিয়া তথায় ইঁহাদের শক্তি মানবের চেয়ে অনেক বেশী। ইঁহারা সাধারণতঃ মানবদের সম্বন্ধে উদাসীন, ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। কিন্তু মানবের দ্বারা উত্যক্ত হইলে অনিষ্ট করেন এবং পূজিত হইলে অনেক উপকারও করেন। উচ্চতর দেবতাগণ ক্রমশঃ উচ্চতর লোকে বাস করেন। ইঁহারা জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিতে মানবাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা সদাই জীব হিতে নিযুক্ত থাকেন; জীবের পালন ও ক্রমোন্নতির জন্য ভগবান্ যাঁহার উপর যে ভার দিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়া যাইতেছেন।

নানা জাতীয় দেবতা।

দেবতাদিগকে মানব কিরূপে বশীভূত বা আকৃষ্ট করিতে পারে? তাহার কোন উপায় আছে কি? আছে। কিন্তু তাহা অতীব গুহ্য; সিদ্ধ পুরুষেরা সাধারণের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন না। তবে তন্ত্রাদিতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, প্রত্যেক দেবতার এক একটি পৃথক মন্ত্র আছে। মন্ত্রই দেবতা, দু'য়ে কোন প্রভেদ নাই। ইহার অর্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিভিন্ন মন্ত্র বিভিন্ন স্পন্দন উৎপাদন করে ও বিভিন্ন মূর্ত্তি সৃষ্টি করে। এই বিভিন্ন স্পন্দন ও বিভিন্ন মূর্ত্তি বিভিন্ন দেবতার উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ। এক প্রকার স্পন্দন হয়ত

দেবতা আকর্ষণ ও দেবতা সিদ্ধি।

যক্ষদিগের অনুকূল ( harmonious )। আর এক প্রকার স্পন্দন গন্ধর্ব্বদিগের উপযোগী, তৃতীয় প্রকার স্পন্দন হয়ত কোন উচ্চ দেবতার উপযোগী। অতএব যদি কোন বিশেষ মন্ত্র একাগ্রভাবে দীর্ঘকাল জপ করা যায়, তাহা হইলে, সেই মন্ত্রের দেবতা অর্থাৎ ( সেই স্পন্দন যে দেবতার প্রীতিপ্রদ সেই দেবতা ) তথায় আকৃষ্ট হন। যেমন মধুর গন্ধ পাইলে মধুমক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, যেখানে ভক্তি কথা হয় সেখানে যেমন চারিদিক হইতে ভক্তেরা আকৃষ্ট হন, আবার যেখানে পরনিন্দা, দুষ্ক্রিয়া ও পাপ মন্ত্রনা হয় সেখানে যেমন দুষ্ট ব্যক্তিরা সহজেই আসিয়া জুটে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। অতএব মন্ত্রদেবতা সাধকের নিকট ( সূক্ষ্মাকাশে ) আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নহে, যদি সাধকের প্রবল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা থাকে, যদি তিনি মন্ত্রের মূর্ত্তিটাকে পূর্ণরূপে ( সূক্ষ্মাকাশে ) গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ দেবতা ঐ মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হন এবং সাধকের কামনা পূর্ণ করেন। যদি সাধক দর্শনাভিলাষী হন, তাহা হইলে দেবতার কৃপায় ক্ষণকালের জন্য সাধকের সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, সাধক দিব্যনেত্রে ঐ সজীব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন। অথবা ঐ মূর্ত্তি ঘনীভূত হইয়া কতকটা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সাধক ও অপরেও উহা দেখিতে পান। সাধক ঐ দেবতার একান্ত অনুগ্রহ ভাজন হন এবং যাহা চান, ( যদি সাধ্যায়ত্ত হয় ) দেবতা তাহাই দান করেন। এইরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্র-সিদ্ধ বা দেবতা-সিদ্ধ পুরুষ বলে।

আমরা দেখিলাম, মন্ত্র, মূর্ত্তি ও দেবতা—একই। যাহা মন্ত্র, তাহাই মূর্ত্তি, শুনিলে বা উচ্চারণ করিলে মন্ত্র, আর দেখিতে পাইলেই মূর্ত্তি; এক দিক থেকে দেখিলে মন্ত্র, অপর দিক থেকে দেখিলে মূর্ত্তি; আবার যেখানে মন্ত্র সেখানেই দেবতা আকৃষ্ট হন, সেখানেই তিনি মূর্ত্তিতে প্রকট হন।

মন্ত্র ও দেবতা এক কেন?

এই প্রকট মূর্ত্তিতেই সাধক দেবতাকে দেখেন, সুতরাং এই মূর্ত্তিই দেবতা ইহাই তাঁহার মনে হয়। এই মূর্ত্তি ছাড়া দেবতা কিরূপ, তাহা তিনি জানেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট মূর্ত্তি ও দেবতা এক। যেমন 'মানুষ' বলিলে দুই হাত, দুই পা বিশিষ্ট একটা মূর্ত্তিই মনে হয়; কারণ এই মূর্ত্তি ছাড়া—মানুষ কিরূপ, তাহা আমরা দেখি নাই। সেইরূপ, 'যক্ষ' বা 'গন্ধর্ব্ব' বলিলেই, সাধকের এক একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তিই মনে হয়, যে যে মূর্ত্তিতে ঐ সকল দেবতা তাঁহার নিকট সদাই আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব, মন্ত্রও যাহা দেবতাও তাই; কারণ দুইই মূর্ত্তি। অবশ্য, এই যে মূর্ত্তিটি ( যে মূর্ত্তিটি মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট হয় ), ইহাই যে ঐ দেবতার একমাত্র মূর্ত্তি তাহা নহে। দেবতা ইচ্ছা করিলে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। তবে, মন্ত্রসৃষ্ট মূর্ত্তিটি, বোধ হয়, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বা কার্য্যসাধিকা।

অতএব, "মন্ত্রসিদ্ধ" বা "দেবতা-সিদ্ধ" বলিয়া যে একটা কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহা অলীক নহে, কুসংস্কারও নহে। প্রকৃতই এরূপ হওয়া যায়, এবং অনেকে হইয়াছেন। তবে, ক্ষুদ্র বা নিম্নশ্রেণীর দেবগণকে যত শীঘ্র বশ করা যায়, উচ্চতর দেবগণকে বশ করা তত সহজ নহে। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপ দেবতার পূজা করেন। যাঁহার কাম, ক্রোধ, মোহ, হিংসাদি প্রবল, তিনি ভূত, প্রেত ও পিশাচাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, যিনি ধন, মান, রূপ; প্রভাব, প্রতিপত্তি পাইতে ইচ্ছুক তিনি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির আশ্রয় লন, এবং যিনি জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, ভক্তির জন্য লালায়িত, তিনি সর্ব্বোচ্চ দেবতাদের শরণাপন্ন হন। গীতায় ভগবান ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

ত্রিবিধ পূজা ও সিদ্ধি।

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥" ( ১৭।৪ )

আমাদের দেশে 'বেদে', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে আজিও দু'একটা 'প্রেতসিদ্ধ' বা 'পিশাচসিদ্ধ' লোক দেখা যায়। কেহ হয়ত এক মুঠা ধূলা লইয়া পয়সা করিয়া দেয়, কেহ হয়ত অঞ্জলিতে প্রস্রাব করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা টাকা করিয়া দেয়, কেহ বা এক জায়গায় এক মণ মিঠাই উদরসাৎ করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করে। যে সকল ব্যক্তি নানা রকম ম্যাজিক বা খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের যে সবই হাতের চাতুরী তাহা নহে। তাহাদের অনেকেরই দু'একটা ক্ষুদ্র সিদ্ধি আছে। আবার অনেকেই বোধ হয় সাপের 'ওঝা' দেখিয়াছেন। ইহারা যে সকলেই প্রতারক, তাহা নহে। প্রকৃত শক্তিশালীও আছেন। কি রূপে এরূপ হইলেন? কোন মন্ত্রের দ্বারা কোন নিম্ন শ্রেণির দেবতাকে বশে আনিয়াছেন। এই দেবযোনির সাহায্যেই তাঁহারা ঐরূপ কৃতকার্য্য হন।

আর একটি বিষয়, ( যাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করেন ) হইতেছে ভারতের তীর্থক্ষেত্র ও দেবমূর্ত্তি। কিরূপে ইহাদের

**তীর্থস্থান ও দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি।**

উৎপত্তি হইল, ইহাদের রহস্যই বা কি, তাহা সম্যক আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এবং করিবার মত শক্তিও নাই। তবে মোটামুটি দুই একটা কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থক্ষেত্রগুলি এক একটি আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র-স্বরূপ, শত শত বৎসর সহস্র সহস্র ভক্ত যাত্রীর সমবেত ভক্তি স্পন্দনে পূর্ণ। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল? স্থানে স্থানে হয় ত কোন কোন মহাপুরুষ কোন কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবতার প্রসন্নতা ও দর্শন

পাইয়াছিলেন। যে মূর্ত্তিতে দেবতা তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হন, লোকহিতের জন্য তাঁহারা সেই সেই স্থানে সেই সেই মূর্ত্তি পাথরে বা মৃত্তিকায় গঠিত করিয়া ( বা করাইয়া ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপেই বোধ হয় ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রের ও দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভগবানের প্রধান প্রধান অবতারগুলিও ভক্তগণদ্বারা প্রস্তরাদিতে গঠিত হইয়া নানা স্থানে পূজিত হইতেছেন এবং কালে সেই সকল স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য।

এখন, তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কিরূপে হয় দেখা যা'ক। এক একটি মূর্ত্তি বা বিগ্রহ এক একটি দেবতার শক্তি-সঞ্চারের কেন্দ্র বা শরীর-স্বরূপ। যেমন, আতুসি কাচ ( lens ) বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে, সেইরূপ এক একটি বিগ্রহ তত্তৎ দেবতার শুভ স্পন্দনকে পুঞ্জীকৃত করিতে পারে ; সুতরাং বিগ্রহের মধ্য দিয়া দেবতা তাঁহার পবিত্র স্পন্দন ( ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ) বিকিরণ করিতে সহজেই সমর্থ হন। যেখানে এইরূপ হয়, সেখানে লোকেরা মূর্ত্তিকে 'জাগ্রত দেবতা' বলিয়া থাকেন। প্রকৃতই সেই মূর্ত্তিতে যেন একটা সজীবতা, একটা জ্যোতি দেখা যায়। অবশ্য সকল তীর্থক্ষেত্রেই যে সকল বিগ্রহই এইরূপ সজীব—জাগ্রত তাহা নহে। যে বিগ্রহগুলিতে উৎপত্তিকালে প্রতিষ্ঠাতা ( বা দেবতা ) যত অধিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন এবং যে বিগ্রহগুলি যত অধিক ভক্ত-যাত্রীর দ্বারা পূজিত হইয়াছেন, সেই বিগ্রহ ততই সজীব, ততই জাগ্রত। প্রথমটির কারণ সহজেই বুঝা যায়। একটা ব্যাটারিতে যত অধিক তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া রাখিবে, বা একটা পুষ্করিণীতে যত অধিক জল পূরিয়া রাখিবে, তাহা ( অল্পে অল্পে ব্যয়িত হইয়া ) তত দীর্ঘকাল থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয়টির কারণ কি? একটি বিগ্রহ যত

অধিক পূজিত হন তাঁহার মাহাত্ম্য বা শক্তি তত বাড়ে কেন? দুইটি হেতু আছে, প্রথম ভক্তদের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন বিগ্রহে সঞ্চিত হইতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্পন্দন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আকর্ষণ করে—টানিয়া আনে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়মটি ( the law of action and reaction ) কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, সকল রাজ্যেই খাটে। তুমি যত জোরে একটি দেবতার দিকে ভক্তির স্পন্দন দিবে, দেবতা হইতে ঠিক তত জোরে একটি প্রতিক্রিয়া আসিবেই।

অতএব দেখা গেল, একটি মূর্ত্তির যত অধিক পূজা হয়, তাহার শক্তিও তত বাড়ে। এখানে আমাদের একটি ভাবিবার বিষয় আছে।

**নিকৃষ্ট দেবতার পূজা পরিত্যাজ্য।**

আমাদের তীর্থক্ষেত্রের সকল মূর্ত্তিগুলিই যে উচ্চতর দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত, তাহা নহে। অনেক মূর্ত্তিতেই নিম্নস্তরের দেব-যোনিগণ ( যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদি ) অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং প্রদত্ত পশু-মাংস ও পশু-রক্তের দ্বারা দীর্ঘকাল তৃপ্ত হইয়া আসিতেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সকল নিকৃষ্ট দেবযোনিকে পূজা ও ভোগ দিয়া সজীব রাখা কর্ত্তব্য কি না? ইহাঁরা আমাদের কতটুকু উপকার করিতে সমর্থ? নীচ বাসনা ( যথা—ধনতৃষ্ণা, শত্রুসংহার, কামিনীসম্ভোগ ইত্যাদি ) চরিতার্থ করা ব্যতীত ইহাঁদের অধিক কিছু করিবার শক্তি নাই; বড় জোর না হয় কোন শারীরিক পীড়া আরাম করিতে পারেন। আমরা কি এখনও নীচ- বাসনার এতই দাস যে এই সকল নিকৃষ্ট দেব-যোনির দ্বারা উহা চরিতার্থ করিতে যত্ন করিব? বোধ হয়, কেহই ইহা স্বীকার করিবেন না। সে যুগ বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। যখন মানব অসভ্য ছিল, দুর্দ্দান্ত ছিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল, ইন্দ্রিয়-প্রবল ছিল, তখন সে পশুবলিদ্বারা, নরবলিদ্বারা, স্থূল মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি জঘন্য উপচার দ্বারা, নিকৃষ্ট দেব-

যোনিকে প্রসন্ন করিয়া পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরা ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, ও জ্ঞানের মহিমা বুঝিয়াছি। আমরা প্রেমের ভিখারী। অতএব বৎস, প্রেমময়ের আশ্রয় লও, আনন্দময়ীর চরণে নিজের কামছাগকে ও ক্রোধ মহিষকে বলি দাও। ইহাই প্রকৃষ্ট বলি।

তীর্থস্থানগুলিকে শক্তিশালী রাখিবার আর একটি উপায় আছে। মহাপুরুষদিগের গমন ও অবস্থান। প্রায় প্রত্যেক তীর্থস্থানেই সাধু মহাত্মারা ছদ্মবেশে যান ও কিছুকাল অবস্থিতি করেন। ইহার কারণ কি? অনেকে ভাবেন তাহারা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই যান; কিন্তু তাহা নহে। মহাপুরুষেরা নিজের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নন; পরের জন্য, জীবের হিতের জন্যই তাঁহারা নানা স্থানে গমনাগমন করেন। তাঁহারা তীর্থক্ষেত্রে গিয়া বিগ্রহে এবং তত্রত্য সূক্ষ্মাকাশে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আসেন; প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের স্পন্দন দিয়া স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়া যান, যেন যাত্রিগণকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে না হয়, যেন তাঁহারা কিছু না কিছু লইয়া আসিতে পারেন। এই লোক-পাবন, পরহিতব্রত, শক্তিশালী মহাপুরুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত অধিক, পৃথিবীর আর কুত্রাপি তত নাহে। এই জন্যই ভারতবর্ষে তীর্থক্ষেত্রও এত অধিক, এই জন্যই ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ এত নির্ম্মল ও পবিত্র, এই জন্যই অনেক বিদেশীয় সাধু ও যোগী ভারতে জন্মগ্রহণ করা ও বাস করা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন।

তীর্থস্থানে শক্তিসঞ্চার।

কেহ কেহ বলিবেন "তীর্থক্ষেত্রে পবিত্রতা কোথায়? যত পাপ, যত দুষ্কার্য্য, যত বীভৎস ব্যাপার তীর্থক্ষেত্রে দেখা যায়, বোধ হয় কুত্রাপি

তীর্থক্ষেত্রে এত পাপ কেন।

সেরূপ নাই।" ঠিক কথা। কিন্তু ইহাদ্বারাই তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতার ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বীজের মধ্যে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত আছে। যদি উহা অনুকূল মৃত্তিকা, রস ও শক্তি পায়, তাহা হইলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়, পুষ্প ফল প্রসব করে, পরে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। অধিকাংশ মানবের মধ্যেই কাম-ক্রোধ লোভাদির বীজ নিহিত আছে। সাধারণতঃ সেগুলি এরূপ প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, যে অনেকে তাহাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারে না। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রের তীব্র স্পন্দনের মধ্যে, ইহারা আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, বাহিরে প্রকাশ পায়, বৃক্ষে পরিণত হয় এবং শেষে মরিয়া যায়। ইহাঁরা যদি তীর্থক্ষেত্রে না থাকিয়া অন্যত্র থাকিতেন, তাহা হইলে এ বীজ গুলি এত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইত না, হয় ত এ জন্মেই হইত না; কিন্তু এক সময় না এক সময় যে হইতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থক্ষেত্রের শক্তি এই যে, উহা ভিতরের পাপগুলিকে বাহির করিয়া দেয়। শরীরের মধ্যে যদি বিষ থাকে, উহা বিস্ফোট-কাদিরূপে ফুটিয়া বাহির হইলেই মঙ্গল এবং সুচিকিৎসকেরা তাহাই করেন। মহাপুরুষদিগের চিকিৎসা-প্রণালীও এইরূপ। এই জন্যই তীর্থস্থানে এত দুষ্কার্য্য লক্ষিত হয়। তীর্থক্ষেত্রে মন্দ বীজগুলি যেমন প্রকাশ পায়, ভাল বীজগুলিও সেইরূপ ফুটিয়া উঠে। যদি দয়া, ভক্তি, প্রেমাদির বীজও অস্ফুট থাকে, তীর্থক্ষেত্র ইহাদিগকেও বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া মনোহর মূর্ত্তিতে সর্ব্বসমক্ষে আনয়ন করেন।

দেব-মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ মূর্ত্তিই কল্পিত নহে। মহাত্মা বা সিদ্ধপুরুষগণ প্রকৃতই যে

মূর্ত্তি-রহস্য।

রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই রূপই নির্ম্মিত বা খোদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই মূর্ত্তির একমাত্র রহস্য নহে। অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, মূর্ত্তির মধ্যে কোন রূপক ( allegory ) থাকিতে পারে, সৃষ্টি-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা উচ্চতর লোকের কোন ঘটনা বা সত্য, মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান থাকিতে পারে। যেমন, শিব-লিঙ্গ—প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গমে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, সর্ব্বত্রই প্রকৃতি-পুরুষ, প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ থাকিতে পারে না, এই তত্ত্বটি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। সেইরূপ, ভগবানের অনন্ত শয্যা, দারুব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতেও উচ্চতম লোকের এক একটি সত্য নিহিত আছে। দ্বিতীয়, মূর্ত্তি কোন বিশিষ্ট ভাবের ( যেমন ভগবানের অনন্ত করুণা, প্রেম বা, ত্যাগের ) দ্যোতক বা জ্ঞাপক হইতে পারে। যেমন, মহাদেব বিরাট ত্যাগের মূর্ত্তি, গঙ্গা ভগবানের অসীম করুণার মূর্ত্তি, ইত্যাদি। অবশ্য, একই মূর্ত্তিকে নানা ভাবে দেখা যায়। জ্ঞানী যে মূর্ত্তিতে একটা বিশ্ব-রহস্য ( cosmic truth ) দেখিতে পান, ভাবুক-ভক্ত তাহাতেই হয় ত অনন্ত প্রেম দেখিতে পাইয়া বিমোহিত হন। জ্ঞানী বা ভাবুক মূর্ত্তিটি দেখেন না—দেখিতে পান না। মূর্ত্তিটি উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এক অসীম জ্ঞান-রাজ্যে বা ভাব-রাজ্যে উঠিয়া যান।

সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে আজকাল আমরা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া থাকি। ইহা অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ

দশবিধ সংস্কার।

সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। অনেকেই এগুলি নিরর্থক ভাবিয়া তুলিয়া দিয়াছেন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় ত ইহাদিগকে কুসংস্কার বলিয়াই মনে করেন; কিন্তু দিব্যদর্শী ঋষিগণ কেন যে এই ব্যবস্থাগুলি করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের দ্বারা কি

গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত যে দশটি সংস্কার করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে দেবতা-পূজা, হোম, মন্ত্র-পাঠাদির বিধি আছে। এতদ্ব্যতীত, তিল, যব, হরিদ্রা, চন্দন, হরীতকী, ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা পূজা ও অন্যান্য ক্রিয়া করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ স্পন্দন আছে এবং কোন কোন দ্রব্য উত্তম স্পন্দন-বাহনও বটে। হোম-( মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি )-দ্বারা একটি অতি প্রবল স্পন্দন সৃষ্ট হয়। এই স্পন্দন দেবতাদিগের অতিশয় অনুকূল ও প্রিয়। এই দ্রব্যাদি ও মন্ত্র এরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, যে, তদ্দ্বারা কার্য্য করিলে বিশেষ বিশেষ উচ্চ দেবতা কর্ম্মস্থলে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের শুভ-স্পন্দনের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মঙ্গল বিধান করেন। শিশু যখন গর্ভে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন হইতেই শুভ-স্পন্দন তৎপ্রতি বর্ষিত হইতে থাকে, তখন হইতেই কোনো বিশেষ দেবতাকে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহার উপর শিশুর রক্ষা-ভার অর্পিত হয়। তৎপরে শিশু ভূমিষ্ট হইলে, পুনরায় সেই দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করা হয়। অতঃপর শিশুর যখন দন্তোদ্গম হয়, যখন মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ( foreign ) অন্ন ভোজনের সময় আইসে, তখনও পুনরায় দেবতার শুভ-স্পন্দন আকৃষ্ট করা হয়, দেবতার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। এইরূপে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেও দেবতার শুভ-শক্তি-দ্বারা বালককে সবল ও দৃঢ় করা হয়, যেন সে তত্তৎ-আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হয়, যেন সে দেবানুকম্পায় স্বীয় কর্ত্তব্য অবিচলিত-ভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়। ইহাই সংস্কারগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যখন হিন্দুর প্রাণ ছিল—যখন দেবতায় প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল,—তখন সে প্রকৃতই দেবতার সাহায্য পাইত। কিন্তু এখন সে প্রাণ নাই,-

সে বিশ্বাস নাই ; সংস্কারগুলিও জীবন-হীন প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং যথানিয়মে সম্পাদিতও হয় না। তাই, আর দেবতা আকৃষ্ট হন না, ক্রিয়াগুলি প্রায়ই নিষ্ফল হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক জন রক্ষা-দেবতা ( Guardian angel ) আছেন, যিনি ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যে সাহায্য ও মঙ্গল প্রদান করেন, এইরূপ একটা বিশ্বাস খৃষ্টানদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

সেইরূপ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ নিরর্থক নহে। ইহা দ্বারা প্রেত ও পিতৃপুরুষগণ বিশেষ উপকৃত হন। 'কিরূপে হন' বুঝিতে গেলে, মৃত্যুর পর জীবের কি অবস্থা হয় একটু জানা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে গমন করেন। এই ভুবর্লোকের সাতটি স্তর বা বিভাগ আছে ; নিম্নতর স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং উচ্চতর স্তরগুলি সূক্ষ্ম। নীচের তিনটি স্তরের নাম প্রেতলোক, এবং উপরের চারটি স্তরের নাম পিতৃলোক। স্তর বলিলে, একটিব উপর আর একটি আছে এরূপ বুঝিবে না ; একটির ভিতরে আর একটি আছে এবং বাহিরেও কিয়দ্দূর বিস্তৃত আছে। যেমন রসগোল্লা রসে ডুবান থাকিলে, রস ভিতরেও থাকে বাহিরেও থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। সে যাহা হউক, জীবকে প্রথমে প্রেতলোকে যাইতে হয়। তাহার সূক্ষ্মদেহে সকল স্তরেরই উপাদান ( matter ) আছে, সুতরাং সে যে স্তরে বাস করে, সেই স্তরের উপাদানগুলিই প্রধানতঃ স্পন্দিত হয়। ইহার ফল এই হয় যে, যতকাল সে প্রেতলোকে থাকে তাহাকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয় ; কারণ, নিম্নস্তরের পরমাণুগুলি স্থূল এবং স্থূল পরমাণুর স্পন্দনই কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসাদি নীচ প্রবৃত্তি। অতএব যত কাল তাহার সূক্ষ্মদেহ হইতে এই স্থূল পরমাণুগুলি ঝরিয়া না যায়,

মৃত্যুর পর প্রেতের অবস্থা।

তত কাল সে এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে যাইতে পারে না, প্রেতলোক হইতে পিতৃলোকে বা পিতৃলোক হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইতে পারে না, তত কাল সে দুষ্প্রবৃত্তির ও নীচ-বাসনার তীব্র তাড়নে জ্বলিতে থাকে, ছট্‌ফট্‌ করে। যদি এরূপ কোন উপায় থাকে, যদ্দ্বারা এই স্থূল উপাদানগুলি শীঘ্র শীঘ্র খসিয়া যায়, সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং প্রেতাত্মা সত্বর যাতনামুক্ত হইয়া উচ্চতর স্তরে বা স্বর্গে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে কোন্ পুত্র, পৌত্র বা আত্মীয়-স্বজন সে উপায়টি অবলম্বন করিতে বাঞ্ছা করেন না? এরূপ নির্দ্দয় ও অকৃতজ্ঞ কেহ আছেন কি?

শ্রাদ্ধ ও তর্পণই সেই উপায়। যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেওয়া হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ এবং যদ্দ্বারা পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন তাহাই তর্পণ। "শ্রদ্ধাপূর্ব্বক" শব্দের অর্থ কি? যাহা দিবে তাহা আন্তরিক ভক্তির সহিত, বিশ্বাসের সহিত, শুভ ইচ্ছার সহিত দেওয়া চাই। যদি কোন দ্রব্য না দিয়া কেবল ভক্তি দাও, কেবল শুভ ইচ্ছা প্রেরণ কর, যদি অন্তরের সহিত একাগ্রচিত্তে বাসনা কর, "পিতৃদেব যন্ত্রণামুক্ত হইয়া স্বর্গ-সুখভোগ করুন," তাহা হইলেও উত্তম শ্রাদ্ধ হইবে, যথেষ্ট ফল পাইবে। কারণ তোমার সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন, শুভ ইচ্ছার স্পন্দন, উদ্দিষ্ট প্রেতাত্মার সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিয়া উহার স্থূল উপাদানকে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে, সূক্ষ্মদেহকে ক্রমশঃ নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া তুলিবে। এইরূপ শ্রাদ্ধ (কেবল শুভ ইচ্ছা প্রেরণ) খ্রীষ্টানাদি অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। কিন্তু হিন্দুর শ্রাদ্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দু কেবল শুভ ইচ্ছা পাঠাইয়াই ক্ষান্ত নন, তিনি মন্ত্রশক্তি এবং দৈবশক্তিও তাহার সহিত যোগ করেন; সুতরাং তাঁহার শ্রাদ্ধের বল অনেক গুণে বর্দ্ধিত হয়। মন্ত্র-স্পন্দনের কতদূর

শ্রাদ্ধ-রহস্য।

প্রভাব এবং দেবানুগ্রহে কতদূর শুভ সাধিত হইতে পারে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই দুই শক্তির সহিত আমাদের শুভ-ইচ্ছা সম্মিলিত হইলে, উদ্দেশ্য যে অতি সহজেই সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মন্ত্রের যে একটা পৃথক শক্তি আছে, উদ্গাতা উহার অর্থ বুঝুন আর নাই বুঝুন যথানিয়মে উচ্চারণ করিলেই একটা ফল পান, এই রহস্যটি না বুঝিয়া কেহ কেহ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বৈদিক মন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তে বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করেন। ইহাতে তাঁহারা শুভ ইচ্ছার ফলটি পান বটে, কিন্তু মন্ত্র-স্পন্দনের ফলটি পান না।

এখন. আহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বড়ই আঁটাআঁটি, বাঁধাবাঁধি নিয়ম। একবার মন্বাদি স্মৃতি বা যোগের কোন পুস্তক উল্টাইলেই দেখা যায় এ বিষয়ে শাস্ত্র কি কঠোর। অমুক দ্রব্য খাইতে পারিবে না, অমুক দ্রব্য স্পর্শও করিতে পারিবে না, এইরূপ পর্য্যায় ক্রমাগত চলিয়াছে। যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন নিষিদ্ধ জিনিস খাইয়া ফেলে, তাহার জন্য আবার প্রায়শ্চিত্ত! শুধু কি তাই? বিহিত জিনিসগুলি যে প্রত্যহ খাইবে, তাহারও উপায় নাই। অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ, নবমীতে লাউ খাইবে না, পঞ্চপর্ব্বে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ, ইত্যাদি। শিক্ষিত হিন্দু এগুলিকে নেহাত অত্যাচার মনে করেন। তিনি ভাবেন 'আপ্ রুচি খানা', যাহা ইচ্ছা হইবে, যাহা শরীরে সহ্য হইবে, তাহাই খাইবে; এ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়মের প্রয়োজন কি?

খাদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের কঠোরতা।

এ সম্বন্ধে, বোধ হয়, আমাদের অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ, যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শিক্ষিত হিন্দুর গুরুস্থানীয়,

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত।

তাহারাই দেখাইয়া দিয়াছেন, আহারের সহিত দেহ ও মনের কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদির দ্বারা দেহের ও মনের কি কি অনিষ্ট সাধিত হয় এবং কেবল শাকসব্জি ফল ও দুগ্ধাদির দ্বারাই মানব সবল, দীর্ঘায়ু ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপে আজকাল যে পরিমাণে মদ্যত্যাগী নিরামিষাশীর দল বাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, কিছুকালের মধ্যে তাহাদের সেরি-শ্যাম্পেন্-চপ্-কাট্লেট্ দুর্ভাগ্য ভারতের বাজারেই বিক্রীত হইবে, তাহাদের দেশে আর ক্রেতা হইবে না।

সে যাহা হউক, বিভিন্ন আহার শরীরের উপর বিভিন্ন ক্রিয়া করে কেন? তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন; কারণ, বিজ্ঞানই দেখাইয়া

খাদ্য মনের উপর ক্রিয়া করে কেন?

দিতেছেন এই এই আহারের দ্বারা এই এই রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, এই এই পদার্থ দেহ মধ্যে সঞ্চিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে কেন তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা বলেন স্থূলদেহের অনুরূপে সূক্ষ্মদেহটি গঠিত হয়। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কি ক্ষিতিতত্ত্ব, কি অপ্‌তত্ত্ব, কি তেজস্তত্ত্ব, সকল তত্ত্বেরই সাত সাতটি স্তর আছে। নিম্ন স্তরের পরমাণুগুলি স্থূল এবং উচ্চস্তরের পরমাণুগুলি সূক্ষ্ম। যদি স্থূল দেহে নিম্নস্তরের পরমাণু সংখ্যা বাড়ে, সূক্ষ্মদেহেও নিম্ন স্তরের পরমাণু-বাড়িবে এবং স্থূল দেহে উচ্চস্তরের পরমাণু বাড়িলে, সূক্ষ্মদেহেও ঠিক তাই হইবে। ইহাই নিয়ম। এখন, মদ্যমাংসাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যের দ্বারা স্থূলদেহের মোটা ( coarse ) পরমাণুগুলি বাড়ে বলিয়া, সূক্ষ্ম দেহেও ঠিক ঐরূপ ঘটে। ইহার ফল এই হয় যে, কাম-ক্রোধ-

লোভাদি বৃদ্ধি পায়; কারণ মোটা পরমাণুগুলির স্পন্দনের নামই কাম ক্রোধাদি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা স্থূল দেহের সূক্ষ্ম (fine) পরমাণুগুলি বৃদ্ধি করিলে, সূক্ষ্মদেহও তদনুরূপ গঠিত হয়, সুতরাং উচ্চ স্পন্দন (দয়া, ভক্তি, বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি) প্রবলতা লাভ করে।

এখন, স্থূল দেহে ও সূক্ষ্ম দেহে উচ্চস্তরের পরমাণুগুলি (finer particles) বাড়িলে আর কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাক। আমরা যেটাকে জ্ঞান বা অনুভূতি (Perception) বলি, সেটা কি? সেটা আর কিছুই নহে, স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তি (power of responding to vibrations)। আমাদের চতুর্দ্দিকে বাহ্যজগতে (স্থূল সূক্ষ্ম সকল জগতেই) অসংখ্য প্রকারের স্পন্দন রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যত অধিক সংখ্যক স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন বাহ্য জগতের জ্ঞান (perception) তাঁহার ততই অধিক হয়। এই মনে কর ইথারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন মাত্র (অমুক সীমা হইতে অমুক সীমা পর্য্যন্ত), আমরা এখন গ্রহণ করিতে পারি, সুতরাং আমাদের আলোক জ্ঞান লালবর্ণ হইতে ভাওলেট বর্ণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমার বাহিরেও অসংখ্য স্পন্দন রহিয়াছে। যাঁহাদের চক্ষু (retina বা brain) এই বাহিরের স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে পারে তাঁহাদের আলোক-জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এইরূপ; যত অধিক স্পন্দন আমরা গ্রহণ করিতে পারিব, যত অধিকসংখ্যক স্পন্দনে আমাদের দেহ স্পন্দিত হইবে, আমাদের অনুভূতি (perception) ততই বাড়িবে। আচ্ছা, সূক্ষ্ম জগৎগুলি (ভুবর্লোক, স্বর্লোকাদি) নিয়তই তো আমাদের চারিদিকে

সকলে সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পায় না কেন?

রহিয়াছে, আমরা তো উহাদের মধ্যে ডুবিয়াই রহিয়াছি, অথচ সে গুলির জ্ঞান ( perception ) আমাদের হয় না কেন? তাহাদের স্পন্দন আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া, তাহাদের স্পন্দনে আমাদের মস্তিষ্ক স্পন্দিত হয় না বলিয়া।

দেখিবার উপায় কি?

কিরূপে এই স্পন্দনগ্রহণপটুতা লাভ করা যায়? একটা খুব চলিত উদাহরণ লওয়া যাক। সেতার বা এস্‌রাজ বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাতে অনেক তার আছে, সরু, মোটা, ছোট বড়, লোহার, রূপার ইত্যাদি। এই তারগুলিকে আবার নানাসুরে, যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে, বাঁধা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটির নিকট যদি নানারকম শব্দ করা হয়, নানাপ্রকার স্পন্দন দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার একটি না একটি তার কাঁপিয়া উঠে। নীচু সুর দিলে মোটা তারগুলি, উচ্চ সুর দিলে সরু তারগুলি কাঁপে। কিন্তু যদি এরূপ উচ্চ বা এরূপ নীচ সুর দেওয়া হয় যাহার অনুরূপ তার ঐ যন্ত্রে নাই, তা'হলে যন্ত্রটি মোটেই কাঁপে না, স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে না। এখন মনে কর এই মোটা তারগুলি দেহের স্থূল পরমাণু ( Coarse particles ) আর সরু তারগুলি সূক্ষ্ম পরমাণু। অতএব বুঝা গেল যে আমাদের দেহের ( স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই ) সূক্ষ্ম পরমাণু যতই বাড়িবে, ততই আমরা সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিব, ততই সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার শক্তি লাভ করিব। এই সূক্ষ্ম পরমাণু বাড়াইবার নানা উপায় আছে। উচ্চ মানসিক চিন্তা, ধ্যান, ও পবিত্রভাব পোষণ করা—এই গুলিই প্রধান উপায়। সাত্বিক আহার অন্যতম উপায়। এই জন্যই যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টি ( clairvoyance ) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান, ইচ্ছামত তথায় গমনাগমন করিতে পারেন এবং নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া থাকেন। কিন্তু "যোগী" শব্দের অর্থ ঠিক এরূপ নহে; যাঁহারা ভগবান বা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছেন, একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী। অতএব এই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যোগী না বলিয়া আমরা সিদ্ধপুরুষ বলিব। তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিকে বিভূতি, ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি বলে। যাঁহারা যোগমার্গ অবলম্বন করেন, কিছুকালের মধ্যেই তাঁহাদের নানাবিধ শক্তি বা সিদ্ধি আয়ত্তে আইসে; কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য খুব উচ্চ, তাঁহারা এগুলির প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। নিম্ন সাধকেরা অথবা যাঁহারা সূক্ষ্মজগতে জীবসেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই প্রায় এইগুলি লইয়া থাকেন।

যোগী ও সিদ্ধ-পুরুষ।

সে যাহা হউক, মানুষের যে এরূপ শক্তি থাকা অসম্ভব নহে, ইহাই অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহারা এগুলিকে অপ্রাকৃত ( unnatural ) বলিয়া মনে করেন। অতএব, সর্ব্বাগ্রে আমাদের বুঝা উচিত জগতে কিছুই অপ্রাকৃত নাই, সমস্তই প্রকৃতির নিয়মাধীন। তবে, প্রকৃতির অনেক স্তর আছে, জড়, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি। জড় প্রকৃতি হইতে জড়বিজ্ঞান-( physical science )-এর সৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্মবিজ্ঞান-( occult science )-এর সৃষ্টি। যাঁহারা জড়-প্রকৃতির ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সাধারণ-সূত্র ( law ) স্থাপন করেন তাঁহারা যেমন বৈজ্ঞানিক, যাঁহারা সূক্ষ্মপ্রকৃতির ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া

জড়বিজ্ঞান ও সূক্ষ্মবিজ্ঞান।

সাধারণ-সূত্র করিতেছেন তাঁহারাও সেইরূপ। জড় বৈজ্ঞানিকদিগের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকের শক্তির সীমা নাই, উহা তাঁহার মধ্যেই আছে, কেবল বিকাশসাপেক্ষ।

সাধারণের একটা ভুল ধারণা আছে। অনেকেই ভাবেন, সিদ্ধপুরুষ মাত্রই খুব পবিত্রাত্মা, সাধু বা ভক্ত। কোন ব্যক্তির কোন অলৌকিক শক্তি দেখিলে তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান, আর ভাবেন ইনি একজন মহাত্মা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির ( ভক্তি বা জ্ঞানের ) কোন সম্বন্ধই নাই। একজন নাস্তিক, নিষ্ঠুর বা লম্পট যেমন অনায়াসে অসাধারণ রসায়নবিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ বা জ্যোতির্বেত্তা হইতে পারেন, সেইরূপ একজন দুষ্টপ্রকৃতি পরপীড়ক দস্যুও দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সিদ্ধপুরুষ হইতে পারেন। সিদ্ধি তো আর কিছুই নহে, সূক্ষ্মজগতে শক্তিলাভের নামই সিদ্ধি। যাহার উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতা আছে, তিনিই ইহা পাইতে পারেন। ভগবানে বিশ্বাস বা নৈতিক চরিত্রের উপর ইহা নির্ভর করে না। বাস্তবিকই, অসাধু, হিংস্রপ্রকৃতি সিদ্ধপুরুষ পৃথিবীতে অনেক আছেন। ইহাঁদিগকে আভিচারিক ( Black Magicians ) বলে। ইহাঁদের দ্বারা জীবের ও জগতের অমঙ্গলই হয়। কিন্তু সাধু ও করুণাময় সিদ্ধপুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক। এই লোক-পাবন জগত্তারণ মহাত্মারা অনুক্ষণ জীবের মঙ্গল করিয়া সেই পরম কারুণিকের সেবা করিতেছেন।

সিদ্ধপুরুষমাত্রই সাধু নহেন।

উপসংহারে, আমরা দু'চারিটি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়া উহাদের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা

লঘিমা। মনে রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধপুরুষগণ সূক্ষ্মজগতে কৃতকার্য্য ও সিদ্ধহস্ত, সুতরাং আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা যেমন সোনা, লোহা, লবণ, চিনি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলিকে স্বেচ্ছামত সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিতে পারেন, তাঁহারা সূক্ষ্মভূতগুলিকে সেরূপ তো পারেনই, অনেক বেশী করিতে পারেন। * দু'একটা উদাহরণ দিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। একটা সিদ্ধি আছে যাহার নাম লঘিমা। অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ নিজ দেহকে (বা অপর কোন বস্তুকে) এরূপ লঘু করিতে পারেন যে উহা আকাশে উড়িতে পারে। এরূপ করিবার তাঁহার নানা প্রণালী আছে। একটি প্রণালী এই—আমাদের উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলের যেমন একটা চাপ (pressure) আছে, ইথারেরও সেইরূপ আছে। কিন্তু ইথারের চাপ বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক বেশী; এখন, যে বস্তুকে লঘু করিতে হইবে, সিদ্ধপুরুষ সেই বস্তুর উপরিভাগস্থ কতকটা ইথার সরাইয়া ফেলেন। ইহার ফল এই হয় যে, যেমন চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর চাপে ব্যারোমিটারের পারদ উপরে উঠে, সেইরূপ চতুঃপার্শ্বস্থ ইথারের চাপে ঐ বস্তুটা উপরে উঠিতে থাকে।

এই ইথারের দ্বারাই তাঁহারা আরও অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকেন, যেমন পদার্থের চূর্ণীকরণ ইত্যাদি। মনে করুন, সম্মুখে একটা

চূর্ণীকরণ। সুদৃঢ় টেবিল রহিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ স্বচ্ছন্দে উহার তলদেশ হইতে কতকটা ইথার সরাইয়া লইতে পারেন। ইহার ফল এই হয় যে, উপরি ভাগস্থ ইথারের প্রচণ্ড চাপে

* এ সম্বন্ধে যাঁহারা একটু বেশী জানিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুত লেডবিটার প্রণীত Clairvoyance এবং শ্রীমতী আনি বেসান্তের Occult Chemistry পাঠ করিবেন।

টেবিলটা ভগ্ন বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের বৈজ্ঞানিকের বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্রের ( Airpumpএর ) ন্যায় তাঁহাদিগকে কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় না। মনের শক্তি ( ইচ্ছাশক্তি ) দ্বারাই তাঁহারা সব করিয়া থাকেন। কোন বস্তুকে ভগ্ন করিবার ইহাই যে একমাত্র উপায়, তাহা নহে; অনেক উপায় আছে। কঠিন পদার্থ মাত্রের একটা আণবিক আকর্ষণ ( Cohesion ) আছে, ইহাই অণুগুলিকে সংহত ও একত্র করিয়া রাখে। সিদ্ধপুরুষ ইচ্ছামাত্র যে কোন স্থানের আকর্ষণকে নষ্ট ( neutralised ) করিতে পারেন। এইরূপে, একটি লোহার বিম্‌কে যত ভাগে ইচ্ছা খণ্ড খণ্ড করিতে পারেন।

( রূপান্তর—Transmutation )

এক পদার্থকে আর এক পদার্থে পরিণত বা রূপান্তরিত করা যায় ( যেমন তাম্র লৌহাদিকে স্বর্ণে ), এই বিশ্বাস সকল জাতির মধ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ইহা অসম্ভব মনে করেন। তাঁহারা বলেন তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি পৃথক পৃথক মূল-পদার্থ ( elements ) অর্থাৎ ইহারা বিশেষ বিশেষ পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত; সুতরাং স্বর্ণের পরমাণু চিরকাল স্বর্ণের পরমাণুই আছে এবং থাকিবে। সকল মূল পদার্থের পক্ষেই এই নিয়ম। ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি ক্রুক্‌স ( Crookes ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এগুলি বাস্তবিক মূল-পদার্থ নহে, সবই যৌগিক পদার্থ ( compounds )। একটি মাত্র মূল-পদার্থ আছে। ইহাকে তিনি প্রোটাইল ( protyle ) বলেন। ( আমরা পূর্ব্বে যাহাকে ৪নং ইথার বলিয়াছি, তাহারই নাম প্রোটাইল )। প্রোটাইলেরই বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণু বিভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হইয়া, বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান তাহাদিগকেই এক একটী মূল-পদার্থ

বলেন। অতএব স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি প্রোটাইল পরমাণুরই সমষ্টি মাত্র। যেমন, কতকগুলি ইটকে দশ দশখানি করিয়া সাজাইলে একপ্রকার আকার হয়, ছয় ছয় খানি করিয়া সাজাইলে আর এক রকম আকার হয়, এবং সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সব একই ইষ্টক স্তূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রোটাইলেরই পরমাণু একভাবে সন্নিবেশিত হইয়া স্বর্ণ, আর একভাবে সন্নিবেশিত হইয়া রৌপ্য ইত্যাদি উৎপাদন করে, এবং ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সবই এক প্রোটাইলে পরিণত হইবে। কিন্তু কিরূপে ভাঙ্গিতে হয়, জড়বিজ্ঞান জানেন না। সিদ্ধপুরুষ তাহা জানেন। শুধু তাহাই নহে; কিরূপে গড়িতে হয়, তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং তিনি লৌহাদিকে প্রথমে প্রোটাইলে পরিণত করেন। তারপর ঐ প্রোটাইলকে যে ভাবে সন্নিবেশিত করিলে স্বর্ণ হয়, সেই ভাবে সংযোজিত করেন। এই উপায়ে তিনি যে কোন ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করিতে পারেন। ইহা একটি উপায় মাত্র, সিদ্ধপুরুষেরা অনেক উপায় জানেন। ক্ষুদ্র দেবযোনি-( Nature-spirits )-দ্বারাও ইহা অনায়াসে করাইয়া লইতে পারেন। সুতরাং সুবর্ণীকরণ একটা স্বপ্ন বা কুসংস্কার নহে।

আমরা কঠিন পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে গ্যাসে পরিণত করিতে পারি, আবার গ্যাসকে তরল ও কঠিন অবস্থায় আনিতে পারি।

( স্থূলীকরণ Materialization )

বৈজ্ঞানিকেরা অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসকে কঠিন করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পারেন। তিনি ইথারকে এবং অপ্ তত্ত্বাদিকেও কঠিন অবস্থায় আনিতে পারেন। ইহারই নাম রণ বা সূক্ষ্মপদার্থকে স্থূল পদার্থে পরিণত করা। এই শক্তি-দ্বারা সিদ্ধপুরুষ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকেন, যেমন

অলৌকিক লিখন, আকস্মিক বস্তুসৃষ্টি ইত্যাদি। * মনে কর এক সিদ্ধপুরুষ বিলাতে আছেন। তিনি তোমাকে একখানি পত্র দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার দোয়াত কলম, কাগজ বা পোষ্টাফিসের প্রয়োজন নাই। তিনি ইথার বা অপ্‌তত্ত্ব হইতে কাগজ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা না করিয়া এইরূপ করেন—তোমার ঘরে অবশ্য কোন কাগজ আছেই, তিনি তাহার উপরেই লিখেন। যাহা লিখিতে হইবে, তিনি প্রথমে সেই অক্ষরগুলির একটা মানসিক চিত্র ( mental image ) করেন। তৎপরে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ চিত্রটিকে তোমার ঘরের কোনও কাগজে পাতিত করেন। অতঃপর বায়ুস্থিত কার্বনিক এসিড হইতে কার্বন অংশ টানিয়া লইয়া ঐ চিত্রের অক্ষরে অক্ষরে বসাইয়া দেন। ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিকত্ব নাই। আমরা যেমন স্বর্ণের রৌপ্যের আরকে ( solution ) পিতল বা তামা ডুবাইয়া একটা তড়িৎস্রোত দিলেই সোনা বা রূপার পরমাণুগুলি ঐ পিতলের উপর ঠিক বসিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। পাতিত চিত্রের উপর যে কার্বনিক এসিড গ্যাস আছে উহাতে তাঁহার শারীর-তড়িৎ ( magnetic current ) দিলেই, কার্ব্বন-পরমাণু ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বসিয়া যায়। এটা তত কঠিন নহে; কঠিন—মানসিক চিত্রটি ঠিক রাখা। এক নিমেষও মন হইতে চিত্রটি অন্তর্হিত হইলে চলিবে না।

এইরূপে সিদ্ধপুরুষ কোন আকস্মিক বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। মনে কর তোমার একটি আংটি হারাইয়াছে। সিদ্ধপুরুষ উহা পূর্ব্বে

* ম্যাডেম্ ব্লাভাট্স্কির এইরূপ অনেক শক্তি ছিল। তিনি অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি কৌতূহল হয়, পাঠক Mr. Sinnett-প্রণীত The occult world পাঠ করিবেন।

আকস্মিক বস্তু হৃষ্ট।

দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উহার যথাযথ মানসিক চিত্র করিতে সমর্থ। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে সেইরূপ আংটি সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। প্রথমে মানসিক চিত্রটি ঠিক রাখিয়া, ( নিকটে যদি কোন স্বর্ণের জিনিস থাকে, যেমন চেন, আংটি, ) তাহা হইতে কতক পরমাণু টানিয়া চিত্রের উপর বসাইতে পারেন। তাহা হইলে আংটি প্রস্তুত হইবে। ইহাতে, অবশ্য, উক্ত চেন প্রভৃতির ওজন কমিয়া যাইবে। যদি কাছে কোন স্বর্ণের জিনিস বা স্বর্ণমিশ্রিত জিনিস না থাকে, তাহা হইলে ইথারকে ( বা প্রয়োজন হইলে অপ্‌তত্ত্বকেও ) স্বর্ণে পরিণত করিয়া নির্দ্দিষ্ট আংটি সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম উপায়টিতে কাজ সহজেই হয়, বেশী শ্রম করিতে হয় না। এইরূপে তিনি ঘড়ী, রুমাল, পুষ্প প্রভৃতি নানা বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্লাভাট্‌স্কি এই প্রকারে নানা দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া অনেক অবিশ্বাসী জড়বাদীকে বিশ্বাসের পথে ফিরাইয়াছেন।

পরিচালনা

কোন স্থূল বস্তুকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াও সিদ্ধ-পুরুষের নিকট কঠিন ব্যাপার নহে। শুনা যায় ব্লাভাট্‌স্কি মান্দ্রাজ হইতে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ( statue ) সিম্‌লা পাহাড়ে আনিয়া অনেককে দেখাইয়াছিলেন। ইহার নানা উপায় থাকিতে পারে। প্রস্তরমূর্ত্তিকে ইথরে পরিণত করিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট ইথার-রাশিকে মান্দ্রাজ হইতে সিম্‌লায় আনিয়া কোন স্থানে ছাড়িয়া দিলেই উহা আপনা আপনিই নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি উহাকে ইথারে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। উহার আণবিক আকর্ষণ ( cohesion ) ধ্বংস করেন নাই। তাই, ছাড়িয়া দিলেই উহা স্বতঃই পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিবে। অথবা ঐ মূর্ত্তিটির একটি মানসিক চিত্র

গড়িয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিত্রটি পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ উপায়টি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

আমরা কয়েকটিমাত্র ক্ষুদ্র সিদ্ধির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। সিদ্ধ-পুরুষ, ইহা ছাড়া অনেক অদ্ভুত-ক্রিয়া করিতে সমর্থ। সেগুলির প্রণালী আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় বুঝিতে অক্ষম। বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ কুলি যেমন টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, ফটোগ্রাফি প্রভৃতির গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ সকল সিদ্ধির রহস্য বুঝিতে পারি না। এরূপ স্থলে, অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া বুঝিবার পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত-ধীমানের কর্ত্তব্য।

সিদ্ধি-রহস্য অনেকস্থলে দুর্ব্বোধ্য।

আমরা দেখিলাম হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির মধ্যে সত্য নিহিত আছে। মন্ত্রজপ, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, তীর্থস্নান, দেবপূজা, শ্রাদ্ধতর্পণ, দশবিধ সংস্কার, উচ্ছিষ্ট বর্জ্জন, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, গুরুসেবা, অস্পৃশ্যবিচার, কোনটিই নিরর্থক নহে—অসার কুসংস্কার নহে। প্রত্যেকটিরই গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, প্রয়োজন আছে। অবশ্য, যাঁহারা উচ্চাধিকারী,—যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বা পরা-ভক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের এ সকল প্রয়োজন না থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ লোক কয়টি? লক্ষ লক্ষ হিন্দুই নিম্নাধিকারী, সুতরাং আচার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। তবে, এ কথা আমি সহস্র-বার স্বীকার করি যে, উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, রহস্য না জানিয়া, কলের পুতুলের ন্যায়, নির্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায়, আচারগুলি পালন করায় বিশেষ ফল নাই। ইহা মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম নহে, ইহা জড়ের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ একটি জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছে; ইহাতে প্রাণ নাই। অজ্ঞানই ইহার কারণ। জ্ঞান ব্যতীত প্রাণ আসে না, আন্তরিক বিশ্বাস

শেষ কথা।

আসে না। হিন্দু সমাজ এখন তাঁহাদের ঋষি-সঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি হারাইয়াছে। থিওসফিই এই চাবি হাতে করিয়া আজ মর্ত্ত্যধামে উপস্থিত। অতএব, ভাই হিন্দু, এই চাবি দিয়া তোমাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ কি অমূল্য রত্নই উহাতে নিহিত আছে। তুমি কর্ম্মীই হও, জ্ঞানীই হও বা ভক্তই হও, তুমি শৈবই হও, শাক্তই হও, বা বৈষ্ণবই হও, তুমি ব্রাহ্মই হও, কবীরপন্থীই হও, বা রাধাস্বামীই হও, তুমি যাহাই হও না কেন, থিওসফি-বর্ত্তিকা হাতে লইয়া স্ব স্ব পথে অগ্রসর হও, দেখিবে, ইহার আলোকে ধর্ম্মের জটিল, অন্ধকারময় প্রদেশগুলিও আলোকিত হইবে। ইহা দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবে, রহস্য বুঝিতে পারিবে। শুধু হিন্দুই বা কেন? খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, পার্শী, জৈন, ইহুদী,—পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মই থিওসফির শুভ্র আলোকে আলোকিত হইয়াছে, নবজীবন পাইতেছে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য দুই হইতে পারে না, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র ধর্ম্ম। থিওসফি সেই ব্রহ্মজ্ঞান বই আর কিছুই নহে। থিওসফি কাহাকেও তাঁহার স্বধর্ম্ম ছাড়িতে বলে না। যিনি যে ধর্ম্মে আছেন তিনি সেই ধর্ম্মেই থাকুন, ইহাই থিওসফির ইচ্ছা। তবে, থিওসফি তাঁহাকে জ্ঞান দিবে, আলোক দিবে। যেমন, একই আকাশ-বারি সকল নদনদী, খালবিলই জলপূর্ণ করে, সকল ভূমিই উর্ব্বরা ও শস্যশ্যামলা করে,—সেইরূপ এই এক মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা (থিওসফি) সকল ধর্ম্মকেই সজীব ও আলোকিত করিতেছে ও করিবে। থিওসফির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে; বোধ হয়, সে দিনের অধিক বিলম্ব নাই। অতএব বৎস, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

# পরিশিষ্ট ( ক )

## "সত্যং শিবং সুন্দরম্" ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচ্য সেই অতি প্রাচীন, পুরাতন, সর্ব্বজন-পরিচিত বিষয়,—সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং"। বিষয়টি পুরাতন হইলেও ইহার আলোচনায় যে লাভ নাই তাহা নহে। যে কোন সত্য যতদিন না আমাদের জীবনে পরিণত হয়, ততদিন তাহাকে পুরাতন ও বিদিত বলা যায় না। উপলব্ধও কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার বারংবার আলোচনায় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যিনি অবাঙ্‌মনস-গোচর,—যৎ সম্বন্ধে মহর্ষি পরমর্ষিগণও অনেক সময় মৌনাবলম্বন করিয়াছেন,—কোনও উত্তর দেন নাই,—সেই অনাদি অনন্ত সংস্বরূপ ব্রহ্মের আলোচনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। অতএব ঋষিবাক্যই আমার অবলম্বন। আমাদের ন্যায় অধম অধিকারীকে বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ যে সকল উপমা ও উপদেশ স্থানে স্থানে প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাদেরই কয়েকটীর উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ আকাশের উপমা। শাস্ত্র ব্রহ্মকে আকাশের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক অসীম অনন্ত আকাশ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাকে শূন্য ( Vacuum ) বলিয়াই ভ্রম হয়। কিন্তু ইহা শূন্য নহে, বিরাট পূর্ণ ( Plenum )। এই আকাশের এক দেশে সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহাদি-সমন্বিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইতেছে, কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অবস্থান করিতেছে এবং পরিশেষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া এই আকাশেই বিলীন হইতেছে। আবার এই পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশ-

মণ্ডলে বায়ু, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির আবির্ভাব হইতেছে এবং তাহাতে কত ভীষণ ঝটিকা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত আদি ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সমস্তই আকাশের মধ্যেই হইতেছে, আকাশ যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, অথচ এই সকল বিকারে আকাশের বিন্দুমাত্র বিকার ঘটিতেছে না। আকাশ নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, সকলের আশ্রয়ভূত হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে সকল বস্তু আকাশে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে, তাহারা অনিত্য, অসৎ,- এই আছে, এই নাই। কিন্তু আকাশ চিরসত্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে,—ইহার বিলোপ বা তিরোধান নাই। এই জন্যই ঋষিগন আকাশের সহিত ব্রহ্মের তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম "তজ্জলান্",—অর্থাৎ ব্রহ্মেই যাবতীয় পদার্থ জাত, জীবিত ও লীন হয়। ব্রহ্ম "সত্যং",—ব্রহ্মের কখনও বিলোপ বা তিরোধান ঘটে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার,—বিশ্বের অসংখ্য পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন বা ভাবান্তর হয় না। অতএব আকাশ ব্রহ্মের একটি প্রতীক (Symbol)।

তার পর সূর্য্যের উপমা। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সৌরজগতের আদিতে সূর্য্য আবির্ভূত হয় এবং সূর্য্য হইতেই গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। সূর্য্য একটি মহান্ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ,—তাহার আলোকেই সব আলোকিত, তাহার তেজেই সকল পদার্থের তেজ ও জীবন, তাহার শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এই কথা ব্রহ্ম সম্বন্ধে খাটে, সূর্য্য সম্বন্ধেও খাটে। স্থূল জগতে যত কিছু শক্তি আছে,—মাধ্যাকর্ষণ, উত্তাপ, তাড়িৎ, চৌম্বক, আণবিক আকর্ষণ ইত্যাদি—সমস্তই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। সূর্য্যের শক্তিতেই গ্রহাদি নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, বায়ু বহিতেছে,

বৃষ্টি পড়িতেছে, অণুপরমাণুগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষলতাদি রসাকর্ষণ করিয়া ফল-পুষ্প প্রসব করিতেছে, প্রাণিগণ পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জীবিত আছে। বাস্তবিক স্থূল জগতের যাবতীয় প্রাণশক্তির মূল কেন্দ্র ও আকর সেই সূর্য্য। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও ঠিক এই। ঋষিগণ ধ্যানস্থ, সমাধিস্থ হইয়া জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তির মূল কারণ ;—কেবল স্থূল জগতের নহে, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতেরও যাবতীয় শক্তির তিনিই আদি ও একমাত্র আকর। উমাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥

"কাহার ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হইয়া মন স্ববিষয়ের প্রতি গমন করে? শরীরাভ্যন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ প্রাণ কাহার নিয়োগ অনুসারে নিজ কার্য্য সম্পাদন করে? কাহার ইচ্ছায় জীবগণ বাক্য উচ্চারণ করে। এবং কোন দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন?" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চ চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকোদমৃতাঃ ভবন্তি ॥

"তিনিই কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতেই এই সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে, ইন্দ্রিয়-গুলির স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই—ইহা বুঝিয়া পণ্ডিতগণ দেহ ত্যাগের পর অমরত্ব লাভ করেন।" অতএব দেখা গেল, ব্রহ্মের ন্যায় সূর্য্য সকল পদার্থের নিমিত্ত কারণ,—অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিতে যেমন সকল বস্তুই শক্তিমান্, সেইরূপ সূর্য্যের শক্তিতেই যাবতীয় স্থূল পদার্থের শক্তি। কিন্তু ব্রহ্ম কেবল বিশ্বের নিমিত্ত কারণ নহেন্, উপাদান কারণও

বটেন। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ······তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং"—যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বীয় শরীর হইতে রস নির্গত করিয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা জাল রচনা করে এবং নিজের মধ্যে উহা গুটাইয়া লয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম কেবল যে স্বীয় শক্তিদ্বারা সমস্ত সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন তাহা নহে, যে উপাদানে বিশ্ব রচিত সেই উপাদানও (matter) তাঁহা হইতে উৎপন্ন। অতএব তিনি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ—দুইই। সূর্য্য সম্বন্ধেও ইহা খাটে। কেবল সূর্য্যের শক্তি দ্বারা যে গ্রহাদি সৃষ্ট তাহা নহে, যত কিছু উপাদান (Matter) গ্রহ-উপগ্রহাদিতে আছে, তৎ সমস্তই সূর্য্য হইতে আগত।

ব্রহ্মের সহিত সূর্য্যের আরও সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্ম মঙ্গলস্বরূপ, সূর্য্যও মঙ্গলস্বরূপ। সূর্য্য অনুক্ষণ তাঁহার তাপ, আলোক ও জীবনীশক্তি বিতরণ করিয়া জীবগণকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করিতেছেন। জীবগণ তাঁহার স্তুতি করুক বা নাই করুক, তিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকারভাবে বায়ু সঞ্চালিত করিতেছেন, বারিবর্ষণ পূর্ব্বক শস্যফলমূলাদি উৎপাদন করিয়া জীবের আহারের সংস্থান করিয়া দিতেছেন, সমুদ্র হইতে বারি আকর্ষণ-পূর্ব্বক পৃথিবীর সর্ব্বত্র নদ-নদীর সৃষ্টি করিয়া মানবের গতায়াত ও কৃষিবাণিজ্যের সুবিধা করিতেছেন, অন্ধকার মোচন করিয়া জীবকে সকল বস্তু দেখিতে পারগ করিতেছেন, দূষিত ও পর্য্যুসিত পদার্থ ধ্বংস করিয়া ও রোগের নানা বীজাণু নষ্ট করিয়া বায়ু জল প্রভৃতি নিত্য বিশোধিত করিতেছেন, জীবমাত্রকে রক্তসঞ্চালনশক্তি, পরিপাকশক্তি ও শ্বাসপ্রশ্বাসশক্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেছেন। প্রত্যুত সূর্য্য আমাদের প্রাণ,—সূর্য্য একদণ্ড না থাকিলে জীবকুল

নির্ম্মূল হইত। অথচ তিনি নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত,—অজস্র দান করাই তাঁহার স্বভাব, প্রতিদান পাইবার তাঁহার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। অতএব তিনি মঙ্গলময়, তিনি শিবস্বরূপ। আবার তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়, পরম সুন্দর। পৃথিবীর যত কিছু সৌন্দর্য্য, সব তাঁহা হইতে। কয়েকদিন যদি সূর্য্য উদিত না হন, পৃথিবী কিরূপ শ্রীহীন হয় একবার ভাবিয়া দেখুন। পত্রপুষ্পের সুন্দর বর্ণ ও সুগন্ধ, নভোমণ্ডলের বিচিত্র বর্ণশোভা, বারিধির বিপুল উত্তাল তরঙ্গ, মলয় মারুতের মনোমুগ্ধকর মৃদু মন্দ হিল্লোল,—সমস্তই সূর্য্যাভাবে বিলুপ্ত হইবে, পৃথিবী নিতান্ত শ্রীহীন, সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়িবে। অতএব সূর্য্য কেবল সত্যস্বরূপ নহেন, তিনি শিব ও সুন্দর। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের প্রতীক, কারণ ব্রহ্ম "সত্যং শিবং সুন্দরং।"

আবার ধরুন বিশাল বারিধি। এক অনন্ত সীমাহীন মহাসমুদ্র ধূ ধূ করিতেছে,—তাহার কুলকিনারা নাই। তাহাতে কত শত, কত কোটি, তরঙ্গ, উর্ম্মি, বুদ্বুদ, ফেন নিয়ত উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। কত দিগ্দেশ হইতে কত শত নদ নদী তাহাতে নিরন্তর নিপতিত হইতেছে। কত অর্ণবযান, সমুদ্রপোত উহার বিরাট বক্ষে বিচরণ করিতেছে। কত তিমি, নক্র, কুম্ভীর প্রভৃতি ভীষণ জলজন্তু উহার বিপুল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতেছে। কিন্তু বারিধির ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি স্থির, প্রশান্ত, নির্ব্বিকার। তিনি সানন্দে ও অবলীলাক্রমে সকলকেই স্বীয় বিরাট ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন। এ দৃশ্য কি সুন্দর, কি মহান্, কি শিক্ষাপ্রদ! ইহা দেখিলে কি সেই "সত্য শিব সুন্দর" কে, সেই অনন্ত মহাসত্তাকে মনে পড়ে না, যাঁহার বক্ষে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড,—কোটি কোটি জীব,—দেবতা, মানব, পশু পক্ষী প্রভৃতি— তরঙ্গ বা জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে, কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেছে এবং

পরে তাঁহাতেই মিশিয়া যাইতেছে? যে তরঙ্গাদি উঠিতেছে, তাহারা তাঁহারই অঙ্গ, তাঁহারই অংশ। যতক্ষণ তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে ততক্ষণই তাহাদের নাম ও রূপ থাকে,—কোনটি তরঙ্গ, কোনটি ফেন, কোনটি বুদ্বুদ। কিন্তু তাহাতে মিশিলে আর নামরূপ থাকে না,—সবই সেই এক সমুদ্র।

আর এই পৃথিবী? এই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী? ইনি কি? ভাবের চক্ষে একবার এই ধরিত্রীকে দর্শন করুন। কি সহিষ্ণুতা, কি ত্যাগ, কি করুণা, কি প্রেম! অথচ কি দৃঢ়তা, কি সত্যসংকল্পতা! এমন দুষ্কার্য্য নাই, এরূপ পাপ ও নিষ্ঠুরতা নাই যাহা মানব পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সম্পাদন না করিতেছে। চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা, ব্যভিচার, গৃহদাহ, (কত নাম করিব) মানবের নিত্য প্রাত্যহিক ঘটনা। তা ছাড়া ধরিত্রীকেই তাহারা অসংখ্য প্রকারে কতই নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত করিতেছে। স্বার্থসাধনোদ্দেশে কূপতড়াগাদি খনন, রেলপথবিস্তার, খনিজ দ্রব্যাহরণ ও সুড়ঙ্গাদি নির্ম্মাণ ব্যপদেশে তাহারা বসুন্ধরাকে নিয়ত কতই ক্লেশ দিতেছে। কিন্তু ধরিত্রী স্থির, ধীর, প্রশান্ত, নির্ব্বিকার। তাঁহার তিলমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি নাই, তাঁহার অপার কারুণ্যবশতঃ তিনি সকলকেই, মহাপাপীকেও স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া পালন ও পোষণ করিতেছেন। করুণাময়ী জননীর ন্যায় তিনি যেন বলিতেছেন, "বাছারা, তোরা সকলেই আমার সন্তান। যারা শিশু, যারা অবুঝ, তারাই না বুঝে অনেক গর্হিত কার্য্য, অনেক পাপ ক'রছে, কিন্তু এটা থাকবে না। একটু বড় হলেই, একটু জ্ঞান হ'লেই এ দোষ শুধরে যাবে। আজ যারা পাপী, কয়েক জন্ম পরে তারাই সাধু হবে। যতদিন না আমার সব সন্তানগুলিই বড় হয়, জ্ঞানী হয়, মুক্ত হয়, ততদিন তোদের ছাড়ব না, বুকে করে রাখব।" এই অসীম করুণা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

কাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়? সেই "সত্য শিব সুন্দর"-স্বরূপ পরম পুরুষকে। আর আমাদের পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবদিগকে। যাঁহারা সাধনাবলে দুর্লভ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও ত্রিতাপতাপিত জীবগণের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের সেই অনন্তভবনীয় আত্মানন্দ হেলায় বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে বাসপূর্ব্বক পাপী তাপী জরামরণক্লিষ্ট মানবকে যুগযুগান্তর স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে আলোকে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে লইয়া যাইতেছেন, যাঁহারা বসুন্ধরার ন্যায় সত্যসংকল্প, দৃঢ়-ব্রত, সর্ব্বংসহ ও সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপ, ধরিত্রী সেই লোকপাবন পরমর্ষিগণকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

এখন দেখা যাক,—আকাশ, সূর্য্য, সমুদ্র ও পৃথিবীর উপমা হইতে আমরা কি বুঝিলাম? এক ও অদ্বিতীয় অনন্ত সত্তা মাত্র অবস্থান করিতেছেন। ইনি কিরূপ, ইনি আলোক বা অন্ধকার, ইনি সৎ বা অসৎ—তাহা আমরা জানি না। ইঁহাকে কোন গুণে বিশেষিত, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। ইনি তমোভূত, অপ্রজ্ঞাত ও অলক্ষণ। এই অনন্ত সত্তার অসংখ্য প্রকাশ-কেন্দ্র (Centres of Manifestation) আছে। মহাসমুদ্রে যেরূপ কোটি কোটি বুদ্বুদ উত্থিত হয় এবং কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই সত্তার অসংখ্য কেন্দ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা নাই, সীমা নাই। "সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।" সমুদ্রতটে বালুকাকণারও সংখ্যা হয়, ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না। কোন একটী কেন্দ্রে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, এই সত্তা সেই কেন্দ্রে পরমাত্মা বা ঈশ্বররূপে প্রকটিত হন। তখন যুগপৎ দুইটী বস্তুর আবির্ভাব হয়,—পুরুষ ও প্রকৃতি ( Spirit & Matter )। পুরুষ যাবতীয় চিৎবস্তুর মূল, প্রকৃতি জড়-

বস্তুর মূল। মূলপ্রকৃতিরূপ উপাধি ধারণ করিয়া যে বিরাট্ পুরুষ প্রকটিত হন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রথম "সৎ চিৎ আনন্দ", তিনিই প্রথম "সত্য, শিব, সুন্দর।" অনন্ত সত্তাকে ( পরব্রহ্মকে ) এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, কারণ তিনি নির্গুণ। অনন্তর এই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিলে, প্রকৃতি বিকৃত, রূপান্তরিত হয় এবং ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্যোমতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্ব উৎপাদন করে। অতঃপর এই সকল তত্ত্বের দ্বারা নানা লোক ( সত্যলোক, জনলোক, মহর্লোকাদি ) এবং তত্তৎ লোকবাসী জীবের ( যথা প্রজাপতি, লোকপাল, মনু, আদিত্যাদি দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ) সৃষ্টি বা প্রকাশ হয়। অবশ্য, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সমস্তই সেই বিরাট পুরুষের মধ্যেই,—ভিতরেই ঘটিতেছে, বাহিরে নহে। তিনি প্রকৃতিরূপ উপাধিতে বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বব্যাপী রহিয়াছেন এবং তাঁহারই এক অংশে প্রকৃতি ঘনীভূত হইয়া নানা লোক ও নানা জীব প্রসব করিতেছে। মনে করুন, যে ইথার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই এক অংশ ঘনীভূত হইয়া বাষ্প, তরল পদার্থ ও কঠিন পদার্থে পরিণত হইল। তাহা হইলে, অনন্ত ইথার যেরূপ এই বাষ্পাদির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বীয় রূপে অবস্থান করে, তাহার স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না, সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্যে জগদাদি আবির্ভূত হইলেও তিনি একাংশে সমস্ত ধারণ করিয়া সমস্তের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, স্বরূপে নিজ মহিমায় অবস্থান করেন। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন, "বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ"—অর্থাৎ একাংশের দ্বারা সমস্ত ধারণ করিয়া আমি যেমন তেমনি আছি, আমার স্বরূপের কোনও বিকৃতি বা বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

জীবসৃষ্টিকে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই জীবপ্রকাশ বলিয়াছি। ইহার কারণ আছে। সৃষ্টিমাত্রই প্রকাশ (emanation বা manifestation),—সেই "সত্য শিব সুন্দর" এর নানা মূর্ত্তিতে নানারূপে আত্মপ্রকাশ। "একোঽহং বহুঃ স্যাম্"—সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বহু হন। ইহারই নাম সৃষ্টি। কিরূপে জীবের আবির্ভাব হয় একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা পূর্ব্ব কল্পে জীব যতটা উন্নতি করে, তাহা তাঁহার উপাধির একটি সনাতন পরমাণুতে (Permanent atomএ) সঞ্চিত থাকে। প্রলয়কালে উপাধির ধ্বংস হইলেও এই পরমাণুর ধ্বংস হয় না। উহা প্রকৃতিতে লীন হইয়া ব্রহ্মের মধ্যেই অবস্থান করে। ইহাই জীবের "চিত্রগুপ্তের লিপি" বা অদৃষ্ট। ইহা দ্বারাই তাহার ভবিষ্যৎ জন্ম ও জীবন নিরূপিত হয়। কল্পারম্ভে ঈশ্বরের প্রথম প্রাণ স্রোত বা শক্তিধারা (First Life-current) সঞ্চারিত হইলে, প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া ক্ষিত্যপতেজ আদি তত্ত্ব প্রসব করে। ইহারই নাম ভূতসৃষ্টি। তার পর ঈশ্বরের দ্বিতীয় জীবন-স্রোত (Second Life wave) প্রবাহিত হয়। ইহাদ্বারা জীবসৃষ্টি হয়। যে সকল অসংখ্য কোটি কোটি "সনাতন পরমাণু" এতকাল প্রকৃতি-বক্ষে মৃতবৎ নিদ্রিত ও নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহারা স্পন্দিত বা কম্পিত হইতে আরম্ভ করে। এই স্পন্দন বা কম্পনের অর্থ আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-দ্বারা জীব যে সকল শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং যাহা এতদিন "সনাতন পরমাণুতে" বীজরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় (potentially, in a latent state) অবস্থান করিতেছিল, তাহা এমন প্রাণের আগমনে সক্রিয় (kinetic) হইয়া উঠে। ইহারই নাম স্পন্দন। এই স্পন্দন সঞ্চিত শক্তির অনুরূপই হয়, অর্থাৎ যে পরমাণুতে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার স্পন্দন ঠিক সেই

শক্তির অনুরূপ হয়। সুতরাং বিভিন্ন পরমাণুর স্পন্দন বিভিন্ন প্রকার হয়। আবার যাহার যেরূপ স্পন্দন সে চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থ হইতে তদনুরূপ উপাদান আকর্ষণ করিয়া স্বীয় উপাধি নির্ম্মাণ করে। অতএব, প্রত্যেক জীবের উপাধি বা দেহ বিভিন্ন প্রকার হয়। মনে করুন, পরমাণুগুলি প্রথমে মহৎতত্ত্বের স্তরে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল। ঐ স্পন্দনানুসারে প্রত্যেকে মহত্তত্ত্বের এক একটি আবরণ বা উপাধি গ্রহণ করিল। অতঃপর ঐ উপাধিগুলি অহংকারতত্ত্বের স্তরে নামিয়া স্ব স্ব স্পন্দনানুসারে আর একটি করিয়া আবরণ পরিধান করিল। এইরূপে যতই তাহারা এক স্তর হইতে স্তরান্তরে অবতরণ করিতে লাগিল, ততই আবরণের উপর আবরণ পড়িতে লাগিল। সুতরাং আবরণ বা উপাধিগুলি আর কিছুই নহে, উহারা জীবের অর্জ্জিত ও সঞ্চিত শক্তির পরিমাপক ও প্রকাশক ( measurement and expression ) মাত্র। এই উপাধিগুলির নিজের কোন শক্তি নাই,—উহারা জড় ও অচেতন; কিন্তু আত্মাদ্বারা,—ঈশ্বরের জীবন-তরঙ্গ দ্বারা—অনুপ্রাণিত হইলে সজীব ও সচেতন হয়। যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডে গীতবাদ্যাদির শব্দ সঞ্চিত হয়, সেইরূপ জীবের সনাতন পরমাণুতে যত কিছু অভিজ্ঞতা, যত কিছু অর্জ্জিত শক্তি সঞ্চিত থাকে। গ্রামোফোনের রেকর্ডের নিজের গান করিবার শক্তি নাই, উহা প্রাণহীন জড়পদার্থ মাত্র; কিন্তু যেমন তন্মধ্যে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হয়, অমনি উহা সক্রিয় ও শব্দশালী হইয়া উঠে। সেইরূপ, "সনাতন পরমাণুর" মধ্যে যেমন আত্মা বা প্রাণশক্তি প্রবিষ্ট হন, উহা অমনি ক্রিয়াশীল হইয়া নানা উপাধি রচনা করে এবং জীবরূপে সংসারে আবির্ভূত হয়। বট, অশ্বত্থ, আম্রাদি বৃক্ষ শত শত জন্মে, শত শত বার বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া যে শক্তি অর্জ্জন করে, তাহা তত্তৎবীজে সঞ্চিত হয়। উক্ত বীজগুলি জড় পদার্থ। কিন্তু সূর্য্য,

জল ও মৃত্তিকাদি হইতে যেমন উহারা "প্রাণ" লাভ করে অমনি স্ফীত ও অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পযুক্ত মহাবৃক্ষ প্রসব করে। আম্রের বীজ হইতে বটবৃক্ষ বা বটের বীজ হইতে অশ্বত্থ জন্মে না। ঠিক এইরূপে যে "সনাতন পরমাণু"তে যাদৃশী শক্তি সঞ্চিত থাকে উহা তদনুরূপই জীব উৎপাদন করে।

অতএব বুঝা গেল, জীবের যাহা কিছু বিশিষ্টতা ও সামর্থ্য ( peculiarity and potentiality ), তাহা "সনাতন পরমাণুতেই" নিহিত থাকে, অর্থাৎ তাহা ঔপাধিক ও স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত। কিন্তু প্রাণ বা আত্মার কোন বিশিষ্টতা নাই। তিনি অবিশেষ, একরূপ ( homogeneous )। তিনি সদাই সত্য, শিব ও সুন্দর। যেমন একই শুভ্র সূর্য্যালোক নানাবর্ণ কাচের মধ্য দিয়া পীত লোহিতাদি নানা বর্ণে প্রকাশিত হয়, যেমন একই বিশুদ্ধ আকাশবারি নানা ভূমিতে পতিত হইয়া নানা বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ ( লবণত্ব, কষায়ত্ব ইত্যাদি ) ধারণ করে, যেমন একই তড়িৎশক্তি ( Electricity ) নানা আধারের ভিতর দিয়া আলোক উত্তাপ শব্দাদি নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করে ও গাড়ীটানা, পাখা ঘুরানো, ঘণ্টা বাজানো প্রভৃতি নানা কার্য্য সাধন করে, সেইরূপ একই "সত্যং শিবং সুন্দরং",—একই আত্মা নানা উপাধি আশ্রয় করিয়া মনু প্রজাপতি, লোকপাল দিক্‌পাল, আদিত্যবসু, ইন্দ্র বরুণ, যক্ষ গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস পিশাচ, মানব পশু প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। ইহা কঠোপনিষদে অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

অতএব "একোঽহং বহুঃ স্যাম্", এক থাকিয়াও তিনি কিরূপে বহু হন, বুঝা গেল। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। তিনি শুভ্র সূর্য্যরশ্মিবৎ সদাই সত্য শিব ও সুন্দর। আধারের বিশিষ্টতা তাঁহাতে উপলিপ্ত হয় না। মনুর মনুত্ব, যক্ষের যক্ষত্ব, পিশাচের পিশাচত্ব,—অর্থাৎ জীবের যেগুলি বিশিষ্টতা তাহা ঔপাধিক,—জীবের স্বকৃত কর্ম্মের ফল। আত্মা এগুলি নহেন। একই তড়িৎ আধারভেদে আলোক, উত্তাপ ও শব্দরূপে প্রকটিত হইলে, ঐ আলোক, উত্তাপ বা শব্দকে তড়িৎ বলা যায় না; এগুলি আধারেরই বিশিষ্টতা, তড়িৎ নহে। এইরূপ একই আত্মা ঋষি, অসুর ও মানবাদিরূপে প্রকটিত হইলেও, ঋষিত্ব, অসুরত্ব বা মানবত্ব আত্মা নহে; এগুলি ঔপাধিক, আধারেরই বিশষ্টতা। আত্মা এই বিশিষ্টতাকে প্রকাশিত করেন মাত্র। আত্মা সর্ব্বদাই সত্য, শিব ও সুন্দর, সর্ব্বদাই অবিশেষ, শুদ্ধ ও নির্ম্মল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবের "সনাতন পরমাণুতে" তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত থাকে। সে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছে, যাহা কিছু নির্ম্মাণ গঠন বা রচনা করিয়াছে, যাহা কিছু অনুভব করিয়াছে, ( যথা ভক্তি, করুণা, প্রেমাদি ), যাহা কিছু কল্পনা, ধ্যান বা ধারণা করিয়াছে বা যাহা কিছু যুক্তি বা বিচার করিয়াছে বা যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তৎসমস্ত পুনর্ব্বার প্রসব ( reproduce ) করিবার, পুনর্ব্বার প্রকটিত করিবার শক্তি সংস্কাররূপে, বীজরূপে, সনাতন পরমাণুতে সঞ্চিত থাকে। এই শক্তিকে মায়া বলা যায়। কারণ, ঈশ্বর যে অঘটনঘটনপটীয়সী বিরাট্ শক্তি দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন, জীবের এই শক্তি সেই মহাশক্তির প্রতিবিম্ব ও প্রতিরূপ মাত্র ( image or reflection )। সমষ্টিতে যাহা, ব্যষ্টিতেও তাহা—As above, so below। সমগ্রে যাহা আছে, অংশেও তাহা আছে। ঈশ্বর সমষ্টি-ভাবে

( macrocosmically ) বিশ্বের যে সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন প্রত্যেক জীব ব্যষ্টিভাবে ( microcosmically ) তাহারই অভিনয় করিতেছেন,—স্ব স্ব উপাধির (বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের) সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতেছেন। এই শক্তিকে মায়াশক্তি বলিবার হেতু আছে। মায়া শব্দ "মা" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার মৌলিক অর্থ—যাহা পরিমাণ করে—that which measures। জীবের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, জীব কতটা দৃষ্টি, চিন্তা ও অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে সনাতন পরমাণুস্থ সংস্কারই তাহার পরিমাপক,—তাহার পরিমাণ দেয়। এইজন্য ইহাকে মায়াশক্তি বলা যায়। আর একটি হেতু এই যে, ইহা জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া তাহাকে সংসারে বিক্ষিপ্ত করে। জীব ( monad ) প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই, ব্রহ্মেরই অংশ; সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই সত্য, শিব, সুন্দর। কিন্তু এই উপাধিগত সংস্কার হেতুই তিনি স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে ক্ষুৎপিপাসা, রোগ-শোক, জরা-মরণাদির অধীন ভাবিয়া সংসারে ক্লেশ ভোগ করেন। অতএব শাস্ত্রে মায়ার যে দুইটি শক্তির উল্লেখ আছে,—আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি,—তাহা জীবের ঐ উপাধিগত সংস্কারের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। সুতরাং মায়া উক্ত সংস্কারেরই নামান্তর মাত্র।

কিন্তু জীবের মায়া ও ঈশ্বরের মায়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। জীব মায়াধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ। মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছাশক্তি; সুতরাং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। কিন্তু জীব যতদিন না মুক্ত হন বা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, ততদিন তিনি মায়ার অধীন, মায়ার উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাঁহাকে "অবশ" বা পরাধীনভাবে সংসারে আসিতে হয়, কর্ম্ম করিতে হয় এবং প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন হইতে হয়। গীতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে,—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

"হে পার্থ, জীবসকল সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে অবশভাবে আগমন করে এবং প্রলয় কালে অবশভাবে লীন হয়।" "অবশ" শব্দটির উপর লক্ষ্য করিবেন। অতএব, জীব পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার বা মায়া-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই. তাহা তাহাকে অবশ-ভাবে সংসারে টানিয়া আনে; কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা নয়। প্রলয়াবসানে যেমন তাহার "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" এই ইচ্ছা উদিত হয়, অমনি সেই অনন্ত সত্তার এক বিরাট কেন্দ্রে তিনি প্রকাশিত হন. "প্রকৃতে র্মহান্, মহতঃ অহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি"—এই অনুলোমক্রমে এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং যতকাল সৃষ্টি ও স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে ততকাল চতুর্দ্দশ ভুবন, অসংখ্য জীব ও অসংখ্য ভূতরূপে একাংশে লীলা করেন। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে ভূলোক চূর্ণ হইয়া ক্ষিতিতত্ত্বে পরিণত হয়, ক্ষিতিতত্ত্ব অপ্‌তত্ত্বে পরিণত হয়, অপ্‌তত্ত্ব তেজস্তত্ত্বে, তেজস্তত্ত্ব বায়ুতত্ত্বে,—এইরূপ এক এক তত্ত্ব ও তদন্তর্গত লোক ও যাবতীয় ভূত প্রতিলোমক্রমে চূর্ণ হইয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর তত্ত্বে লীন হইয়া যায়। অবশেষে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আদিতত্ত্ব বা প্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং প্রকৃতি সেই অনন্ত মহাসত্তায় লীন হন। তাহা হইলে তখন থাকে কি? থাকেন কেবল মায়া। সে বিপুল কেন্দ্রে সেই অঘটনঘটনপটীয়সী, সেই জগৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী, পূর্ব্ববিশ্বের সর্ব্ব সংস্কার-ধারয়িত্রী মায়া-শক্তি থাকিয়া যান। ইতঃপূর্ব্বে বিশ্বের যা কিছু ঘটিয়াছে,—যে সকল ভূত ও লোক জন্মগ্রহণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছে,—প্রজাপতি, মনু, ঋষি, সুর, অসুর ও মানবাদি রূপে ভগবান্ যাহা কিছু অনুষ্ঠান বা চিন্তা করিয়াছেন,—তৎসমুদায়েরই স্মৃতি বা সংস্কার, বীজরূপে,—অব্যক্ত

শক্তিরূপে সেই কেন্দ্রে থাকিয়া যায়,—পরবর্ত্তী সৃষ্টিকালের জন্য অপেক্ষা করে। ইহাই ঈশ্বরের মায়া-শক্তি। জীবের সনাতন পরমাণুতে যেমন পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত যাবতীয় সংস্কার, বীজরূপে—অব্যক্ত শক্তিরূপে থাকে, সেইরূপ এই বিরাট্ কেন্দ্রে বিশ্বের যাবতীয় সংস্কার বীজরূপে প্রকৃতি মধ্যে অপেক্ষা করে। ইহাই মায়া। দেবী ভাগবতে মায়ার এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে :—

এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ॥

"প্রলয়-কালে ইনি ( মায়া ) সমগ্র বিশ্ব নিজমধ্যে সংহার করিয়া এবং নিজ শরীরে সকল জীবের লিঙ্গ ( বীজ বা সংস্কার ) ধারণ করিয়া ক্রীড়া করেন।"

জীব ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বররূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ :—

"মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"—গীতা

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।"—মুণ্ডক

অতএব ঈশ্বর যেমন সত্য, শিব ও সুন্দর, জীবও সেইরূপ। কিন্তু ঈশ্বর মায়ার অধিপতি বলিয়া জগদাদি রচনা করিয়াও সদাই স্বরূপে—সত্য, শিব, সুন্দররূপে—অবস্থান করেন। তাঁহার স্বরূপের কোন প্রকার বিকার বা ব্যতিক্রম হয় না। মায়াধীন জীবের এরূপ ঘটে না। তিনি যেমন উপাধি বা দেহ ধারণ করিয়া সংসারে অবতীর্ণ হন, অমনি তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে; উপাধিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। উপাধির জন্ম-মৃত্যু হয়। তিনি ভাবেন, "আমারই জন্ম-মৃত্যু হইয়াছে।" উপাধি ক্ষুধা-পিপাসা, হ্রাস-বৃদ্ধি, শীত-আতপ, আশা-ভয়, কাম-ক্রোধ, হর্ষ-বিষাদ, রোগ-শোক প্রভৃতি নানা বিকারে বিক্ষোভিত ও আন্দোলিত হইলে

তিনি মনে করেন, "আমি ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইতেছি, আমারই শীত বা গ্রীষ্ম হইতেছে, আমি রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত হইতেছি অথবা আমারই অর্থলাভ বা পুত্রনাশ ঘটিতেছে।" তিনি যে সদাই "সত্য, শিব ও সুন্দর" স্বরূপ, তাঁহার যে জন্ম-মরণাদি কোন বিকার নাই, তিনি যে চিরকাল অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দ ও শান্তিস্বরূপ, সর্ব্বভূতের সর্ব্ব-লোকের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা তিনি বিস্মৃত হন, উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহারই নাম দেহাত্মবোধ এবং ইহার কারণ মায়া বা অজ্ঞান।

এই দেহাত্মবোধ নাশ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করাকেই মুক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। কিন্তু জীব চিদণু (Monad) রূপে ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, হঠাৎ বা এক জন্মে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে না। তাঁহাকে নানা স্তর অতিক্রম করিতে হয়, নানা যোনি পরিভ্রমণ করিতে হয়। মনুষ্য-স্তরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে যথাক্রমে তিনটী এলিমেণ্ট্যালের অবস্থা, খনিজ, উদ্ভিদ ও পশুর অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। ইহাকেই ক্রমোন্নতি (evolution) বলে। এই ক্রমোন্নতিবাদ বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টাক্ষরে সূচিত হইয়াছে, যথা—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজংনবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ত্রিংশল্লক্ষং পশূণাং চ চতুর্লক্ষঞ্চ চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততো কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্ব মুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ"

অর্থাৎ স্থাবর (খনিজ উদ্ভিদাদি) রূপে কুড়ি লক্ষ জন্ম, মৎস্যাদি রূপে নয় লক্ষ, কচ্ছপাদিরূপে নয় লক্ষ, পক্ষীরূপে দশ লক্ষ, পশুরূপে ত্রিশলক্ষ ও

বানরাদিরূপে চারিলক্ষ জন্ম অতীত হইলে তবে জীব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া সাধন মার্গ অবলম্বন করেন। অতঃপর ( গুরুকৃপায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে ) তিনি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন ও সর্ব্বযোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। এই যে ক্রমোন্নতির কথা উক্ত হইয়াছে, এই উন্নতি কাহার হয়? চিদণু বা আত্মা তো চিরদিনই সত্য, শিব ও সুন্দর। তাঁহার কোন উন্নতি বা অবনতি নাই। তবে এই ক্রমোন্নতি কাহার? এই উন্নতি হয় দেহের বা উপাধির। দেহ যতই শুদ্ধ, পবিত্র ও সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত হয়, আত্মা ততই উহাতে প্রকাশিত হন। যেমন সূর্য্যরশ্মি চিরকালই শুভ্র ও তেজোময় রহিয়াছে; কিন্তু দর্পণ বা স্বচ্ছ সরোবরাদিতে উহা যতটা প্রতিবিম্বিত হয়, গোময় বা মৃত্তিকাদিতে ততটা হয় না। সেইরূপ উপাধিভেদে আত্মার বিকাশের তারতম্য ঘটে। খনিজ অপেক্ষা উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ অপেক্ষা পশুতে এবং পশু অপেক্ষা মানবে ইনি সমধিক প্রকটিত। এই রূপে উপাধি যতই উচ্চতর, বৃহত্তর হয়, জীব ততই উচ্চ স্থান লাভ করেন,—ঋষিত্ব, মনুত্ব, প্রজাপতিত্বাদি পাইয়া শেষে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব, উপাধির উন্নতিকেই জীবের ক্রমোন্নতি বলে। এই উপাধিনির্ম্মাণই ভগবানের উদ্দেশ্য। ক্রমশঃ উচ্চতর পবিত্রতর ও সূক্ষ্মতর দেহ-নির্ম্মাণের জন্যই জীব সংসারে নিপতিত হন। দেহাভিমান বা দেহাত্মবোধ না থাকিলে এই উপাধি-নির্ম্মাণকার্য্য সম্ভব হইত না। "দেহই আমি, দেহের সুখেই আমার সুখ"—এই বোধ যদি জীবের না থাকিত, তাহা হইলে সে কদাপি দেহের সংরক্ষণে বা উন্নতিসাধনে যত্নপর হইত না। এই জন্যই ভগবান্ প্রথমে জীবের মধ্যে অস্মিতা, অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি প্রদান করেন। জীবের প্রথমতঃ স্থূলদেহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন। সুতরাং ভগবদিচ্ছায় মানব ভীষণরূপে স্থূলদেহাভিমানী হন। এই দেহাভিমানবশতঃ তিনি

ভয়ানক স্বার্থপর ও দেহসর্ব্বস্ব হইয়া পরস্বাপহরণ, চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যাদি দ্বারা দেহের সুখসাধনে অগ্রসর হয় এবং অতিরিক্ত পানভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেহের আনন্দ বিধান করেন। কিন্তু মঙ্গলময়ের অব্যর্থ বিধানানুসারে তাঁহাকে পদে পদে দুঃখ ও ক্লেশ পাইতে হয়। লোক-নিন্দা, রাজদণ্ড, নির্য্যাতন, নিপীড়ন তো আছেই, তদুপরি যে দেহের জন্য তিনি এত ব্যাকুল, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও পানভোজনাদি হেতু সেই দেহই দুর্ব্বল, রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার চিন্তা হয়, চৈতন্য উদিত হয়। তিনি সংযমী হন, একটু একটু চিন্তাশীল হন। নিয়মিত আহার, বিহার ও ব্যায়ামাদি দ্বারা দেহ সুস্থ রাখেন এবং মধ্যে মধ্যে ভাবিতে থাকেন, "লুণ্ঠন, পরপীড়নাদি দ্বারা যে সুখ পাই, তাহা অপেক্ষা দুঃখই তো অনেক অধিক। লুণ্ঠিত অর্থাদি দ্বারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ হয় বটে, কিন্তু অপমান, ভয়, লজ্জা, কারাক্লেশ প্রভৃতির দুঃখ মধ্যে মধ্যে অসহ্য হইয়া উঠে। তা' ছাড়া যাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করি, তাহাদিগের কতই ক্লেশ হয়! যাহারা সৎপথে থাকিয়া স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহারা আমা অপেক্ষা নিশ্চয়ই সুখী।" এইরূপে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূক্ষ্মোপাধি বা মনোময় কোষের (astromental body র) উন্নতি হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি যতই চিন্তাশীল হন, স্থূলদেহের প্রতি দৃষ্টি ততই কমিয়া যায়, মানসদেহের স্পন্দন ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির চর্চ্চায় তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করেন। কিরূপে সূক্ষ্মদেহ বিশোধিত ও সুগঠিত হয় সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা উচ্চ ও পবিত্র চিন্তা যতই চিত্তে ধারণ করি, আমাদের মানস-দেহের সূক্ষ্মতর পরমাণু-গুলি ততই স্পন্দিত হয় এবং তেজস্তত্ত্ব হইতে তজ্জাতীয় পরমাণু আকর্ষণ

করে। এইরূপে মানস-দেহে সূক্ষ্মতর পরমাণুর সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হয়, স্থূল পরমাণুগুলি ততই স্থানভ্রষ্ট হইয়া দেহচ্যুত হইতে থাকে। দীর্ঘ সাধনার পর—বহুকাল উক্তরূপে অভ্যাস করিলে—সূক্ষ্মদেহ এরূপ বিশোধিত হইতে পারে যে, উহাতে স্থূল পরমাণু প্রায় আদৌ থাকে না; সুতরাং উচ্চ ভাব ও পবিত্র চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন ভাব—নিকৃষ্ট, স্বার্থপর বা নীচ চিন্তা—উদিতই হইতে পারে না, উদিত হওয়া অসম্ভব হয়।

সূক্ষ্মদেহের উন্নতির সহিত কারণ-দেহও ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প উন্নত হইতে থাকে। বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ ও হিরণ্ময় কোষ দ্বারা এই কারণদেহ গঠিত। এই কোষত্রয় যথাক্রমে আনবিক তেজস্তত্ব (Atomic mental matter ), বায়ুতত্ত্ব (Buddhic matter) এবং ব্যোমতত্ব ( Nirvanic matter ) দ্বারা নির্ম্মিত। এই কারণ-দেহই বর্ত্তমান মানবের জীবাত্মা। ইনি অজরামরবৎ নিজ ভূমিতে অবস্থান করেন। ইঁহারই এক অংশ প্রতি জন্মে সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং পুণ্য-কর্ম্মদ্বারা যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা লইয়া গিয়া নিজের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করেন। এই কারণ-দেহেই আত্মার তিনটি ভাব—সৎ চিৎ আনন্দ বা সত্য শিব সুন্দর—সম্যক্‌রূপে প্রতিবিম্বিত বা প্রকাশিত হইতে পারে। অতএব, কারণ-দেহ যতই পরিপুষ্ট ও সুগঠিত হয়, ততই আত্মা ইহাতে প্রকটিত হন, অর্থাৎ ততই আমরা আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করি, ততই আত্ম-জ্ঞান উদিত হয়। কিন্তু কারণ-দেহের সত্বর উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে তীব্র ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সাধারণ মানবের ন্যায় গতানুগতিক লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিলে, উন্নতি যে একবারেই হয় না তাহা নহে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে ও বহু জন্মে ঘটে। পক্ষান্তরে

যাঁহারা নির্ভীক, বলশালী ও দৃঢ়ব্রত, যাঁহারা "শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথ" অবলম্বন করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা অচিরে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ঋষি ও মহর্ষিগণ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্য জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়া শিষ্যগণকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, আজ আমরা এই থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করিয়া সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের অথবা তাঁহাদের উন্নত শিষ্যবর্গের শিষ্যত্ব লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহা বড় অল্প সৌভাগ্য নহে। এরূপ সুযোগ বিরল,—অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। আমরা কি ইহা হেলায় হারাইব? ইহার সদ্ব্যবহার করিব না? ঐ দেখুন প্রশান্তচেতা করুণাময় ঋষিগণ আমাদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিবার জন্য সৌৎসুক্যে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। আমরা কি তাঁহাদিগের দিকে এক পদও অগ্রসর হইব না? ঐ শুনুন ত্রিতাপ-তাপিত অজ্ঞানান্ধ জীবের রোগ-শোক-জরা-মরণাদি দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাঁহারা ব্যাকুল-ভাবে বলিতেছেন,—

"ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর॥
রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃ সুখং চর॥
দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক বৃদ্ধিঃ ক চ বা হানিঃ তব চিন্মাত্ররূপিনঃ॥
ত্বয্যনন্ত মহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধিঃ ন বা ক্ষতিঃ॥"—অষ্টাবক্রসংহিতা

"বৎস! তুমি দেহ নহ, তোমার দেহও নাই। তুমি অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব, সুখ-দুঃখাদি ভোগ তোমার নাই এবং কোন কার্য্যও তুমি কর না। দেহই ভোগ করে, দেহই কার্য্য করে। তুমি চিরকাল সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান। তুমি কাহারও অপেক্ষা কর না, তুমি স্বাধীন। অতএব সুখে বিচরণ কর। রাগ ( বিষয়াসক্তি ) ও দ্বেষ,—এই দুইটিই আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ। কিন্তু এই দুইটি মনের ধর্ম্ম। তুমি তো মন নহ; অতএব, তোমার রাগও নাই, দ্বেষও নাই। তুমি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকল্প ও নির্ব্বিকার বোধস্বরূপ অবস্থান করিতেছ। অতএব সুখে বিচরণ কর। দেহ এক কল্পই থাক অথবা আজই ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, ইহাতে তোমার কিছুই যায় আসে না, তোমার কোন লাভ লোকসান নাই। কারণ, তুমি তো দেহ নহ, তুমি চিন্মাত্ররূপী অবিনশ্বর আত্মা। আকাশে কতই মেঘ উঠে এবং কিছুক্ষণ ঝড়-বৃষ্টির পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! ইহাতে আকাশের কিছু হয় কি? যেমন আকাশ তেমনই থাকে। সেইরূপ তোমার কত দেহ হইতেছে, কত দেহ যাইতেছে; কিন্তু তুমি যেমন নির্ব্বিকার তেমনই আছ। তুমি অনন্ত মহাসমুদ্রস্বরূপ—স্থির ধীর প্রশান্ত। তোমাতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কত তরঙ্গ নিয়ত উত্থিত হইতেছে এবং কল্পান্তে বিলীন হইতেছে। ইহাতে তোমার কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি নাই! তুমি চিরকালই নির্ব্বিকার রহিয়াছ,—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" রূপে বিরাজ করিতেছ।"

অতএব, আসুন,—ঋষিপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা আজ হইতে, এই মুহূর্ত্ত হইতে, অনুক্ষণ এই ভাবিতে চেষ্টা করি—আমি সত্য, শিব ও সুন্দর। আমি সত্য স্বরূপ। চিরকাল, অনন্তকাল আমি একরস ও একরূপ রহিয়াছি। আমার সত্তার কদাপি বিলোপ, বিকার, পরিণাম, রূপান্তর বা ভাবান্তর ঘটে না। অতএব আমার ক্ষুধা-পিপাসা

নাই, শীত-গ্রীষ্ম নাই, বাল্য-যৌবন নাই, জরা-মৃত্যু নাই, আধি-ব্যাধি নাই, অবসাদ-ক্লান্তি নাই। কারণ আমি সত্যস্বরূপ,—চিরকাল জ্ঞান ও শান্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছি। ক্ষুৎপিপাসাদি বিকার বা জন্ম-মরণাদি পরিণাম অসত্য পদার্থেরই ঘটিতে পারে। যাহা চিরকাল সত্য, তাহার বিকার ও পরিণাম কিরূপে সম্ভব? অতএব, উক্ত বিকার দেহেরই হইতেছে। দেহ কখন স্থূল, কখনও কৃশ হইতেছে, কখনও রুগ্ন কখনও সুস্থ, কখনও জাত কখনও মৃত হইতেছে! ইহাতে আমার কি? আমি চিরকাল জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ রহিয়াছি। দেহের বিকারে আমার বিকার ঘটিতে পারে না; কারণ আমি দেহ নহি, আমি সত্যস্বরূপ আত্মা। আবার, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, হর্ষ-বিষাদ, আশা-ভয়, হিংসা-দ্বেষ, শোক-দুঃখ প্রভৃতি ভাবান্তর কাহার হয়? আমার এগুলি নাই, থাকিতে পারে না; কারণ আমি সত্যস্বরূপ,—সদাই নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। কে প্রিয় বস্তু পাইলে হৃষ্ট ও অপ্রিয় বস্তু পাইলে বিষণ্ণ হয়? লক্ষ মুদ্রা, সুন্দরী রমণী বা চাটুবাক্য দ্বারা কে তুষ্ট হয়? এবং অপমান, পরুষ বাক্য বা প্রহার দ্বারা কে রুষ্ট হয়? অসংযত মন। কারণ, রাগ ও দ্বেষ মনেরই ধর্ম্ম। কিন্তু আমি মন নহি। অতএব, আমার কোন বিকার নাই। কেহ প্রহার করুক বা লক্ষ্য মুদ্রা দান করুক, অথবা বহুমান করুক বা অপমান করুক, আমার পক্ষে তুল্য। আমি নির্ব্বিকার, চিরপ্রশান্ত, প্রেমময়, করুণাময়। কারণ আমি সত্যস্বরূপ,—আমাতে কোন ভাবান্তর হইতে পারে না। ধরিত্রী যেমন অসংখ্য জীবকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পালন ও পোষণ করেন,—কদাপি অন্যথাচরণ করেন না, আমিও সেইরূপ চিরকাল কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, নর-বানর, দেবাসুর প্রভৃতি অসংখ্য জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া পালন করিতেছি। জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ আমার নিন্দা

করুক, পীড়ন করুক, অথবা দেহ খণ্ড বিখণ্ড করুক, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি না ; কারণ, আমি সত্য-সংকল্প,—কদাপি সংকল্পচ্যুত হইতে পারি না। আমি সত্যময়,—সুতরাং আমার বাক্য সত্য, কার্য্য সত্য, চিন্তা সত্য। অসত্য কথা, অসত্য কার্য্য, অসত্য চিন্তা আমার নাই, থাকিতে পারে না"

অতঃপর চিন্তা করুন, "আমি শিবস্বরূপ,—চিরকাল মঙ্গলময়। সুতরাং কোনরূপ অশিব বা অমঙ্গল আমা হইতে আসিতে পারে না। আমি নিয়ত জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছি,—অসংখ্য জীবকে ধারণ করিয়া তাহাদের ক্রমোন্নতি-সাধনে নিবিষ্ট আছি। যেমন স্বভাব-মধুর শর্করাতে তিক্ততা নাই, যেমন স্বভাবোজ্জ্বল সৌরকরে অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ স্বভাব-মঙ্গলময় আমাতে অমঙ্গল থাকা অসম্ভব। দস্যু-তস্করাদি কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব, দাম্ভিকাদি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং নিষ্ঠুর-নৃশংসাদি কর্ত্তৃক প্রহৃত ও নিপীড়িত হইলে কে রোষে ও প্রতিহিংসায় প্রদীপ্ত হয় এবং অনিষ্টকারীর অমঙ্গল কামনা করে? অসংযত দেহ, অসংযত মন,—"দুষ্টাশ্বাঃ ইব সারথেঃ"। আমি অমঙ্গল করিতে পারি না ; আমি প্রেমে, করুণায় বিগলিত হই এবং চিন্তা করি 'হায়! আমার এই অজ্ঞান শিশু ভ্রাতৃগণ না বুঝিয়া কি ভীষণ কার্য্যই করিতেছে এবং কত ক্লেশই পাইতেছে!' এই ভাবিয়া তাহাদের মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হই। আমার চিন্তা মঙ্গলময়, আমার বাক্য মঙ্গলময়, কারণ আমি শিবস্বরূপ।

আরও চিন্তা করুন, "আমি পরম সুন্দর। বাহ্য বা আন্তর জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে, সবই আমা হইতে। পুষ্পের সৌরভ ও বর্ণ-বৈচিত্র্য, তারকা-খচিত নভোমণ্ডলের শোভা, বিশাল বারিধি ও অভ্র-ভেদী গিরিরাজির গাম্ভীর্য্য, কোকিলের কুহুরব, শ্বেতহংসের জলকেলি,

শিশুর সরল হাস্য, মাতার স্নেহ, রমণীর পতি-প্রেম, চিত্তের পবিত্রতা, গৃহ, আসবাব ও পোষাক পরিচ্ছদাদির নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা, কণ্ঠস্বরের কোমলতা ও মাধুর্য্য,—প্রভৃতি যত কিছু সৌন্দর্য্য জগতে আছে,—সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন, কারণ আমিই সকল সৌন্দর্য্যের মূল ও আকর। আমার চিত্তে কোনরূপ কুৎসিত ভাব, অপবিত্র চিন্তা—হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, বিষাদ আদি—থাকিতে পারে না ; উহা নিয়তই আনন্দ, প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ। কারণ আমি সুন্দর। আমার বাক্য সর্ব্বদাই মধুর, কোমল ও পবিত্র ; উহাতে অশ্লীলতা, পরুষতা, রূঢ়তা বা কপটতা থাকা অসম্ভব। কারণ, আমি সুন্দর। আমার শরীর ও পরিচ্ছদাদি সদাই নির্ম্মল ও পবিত্র ; উহাতে কোন ময়লা নাই এবং বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও প্রসন্ন,—উহাতে বিষাদের বিন্দুমাত্র কালিমা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি সুন্দর। আমি যে স্থানে বাস করি, যথায় গমন করি, যাহাদের সহিত মিলিত হই ও বাক্যালাপ করি, তৎ-সমুদয়ই সুন্দর করিয়া ফেলি, কোনও কুৎসিত বস্তু বা ভাব কোনও অপবিত্রতা, অশ্লীলতা, বিষাদ-নৈরাশ্য, কোনও ময়লা বা দুর্গন্ধ, কোনও হিংসা-দ্বেষ-বা স্বার্থপরতা সেখানে থাকিতে পারে না। কারণ, আমি সুন্দর।"

অনুক্ষণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা সত্য, শিব ও সুন্দর হইয়া যাইব,—আমরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। তখন আমাদের এক অপূর্ব্ব অবস্থা থাকিবে। তাহা অভাবনীয়, অননুভবনীয়। তখন আমরা দেখিব আমরা সত্যস্বরূপ হইয়াছি, অসত্য বা মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দৃষ্টি আর আমাদের নাই। জগতের সমস্ত সত্য আমরা দেখিতে পাইব, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইব। জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা তখন আমরা মিথ্যা বলিয়া বুঝিব। তখন আমরা বুঝিব আমরা চিরকাল একরূপে

অবস্থান করিতেছি,—স্থির, প্রশান্ত, করুণাময়, মঙ্গলময়রূপে চিরদিন বিহার করিতেছি। তখন আমরা সেই "আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ" সমুদ্রের ন্যায় হইব যাহা শত সহস্র নদ নদী চতুর্দ্দিক হইতে পতিত হইলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তখন আমরা দেখিব আমিই (আত্মা) সব, আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই; আমি নানা মূর্ত্তি ও নানা রূপ ধারণ করিয়া অসংখ্য জীবরূপে অবস্থান করিতেছি; অথবা অসংখ্য জীব আমারই অংশ, আমি ধরিত্রীর ন্যায় তাঁহাদিগকে বিশাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সৃষ্টি, পালন ও পোষণ করিতেছি। সুতরাং জীবের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, জীবের আনন্দেই আমার আনন্দ। মুক্তপুরুষের এই শেষোক্ত লক্ষণটি অষ্টাবক্র মুনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকল্পো শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিনির্বৃতঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, সমস্তই "আমি" এই নিশ্চয় বা স্থির জ্ঞান জন্মে এবং তিনি বিকল্পশূন্য, পবিত্র, শান্ত এবং কোন বস্তু প্রাপ্ত হউন বা নাই হউন, নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করেন।

# পরিশিষ্ট ( খ )

## জীবের কল্যাণ

জগৎ জীবময়, সর্ব্বত্রই জীব। জল, স্থল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ,—কোন স্থানই জীবশূন্য নহে। এই সকল জীবের কল্যাণ কি,—ইহাই এখন আলোচ্য। প্রথমে দেখা যাক জীবের উদ্দেশ্য কি,—কি অভিপ্রায়ে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন ক্রমোন্নতিই জীবের উদ্দেশ্য। আজ যে জীব নিস্পন্দ ও অচেতনপ্রায় অবস্থায় খনিজের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, কালে সে উন্নত হইয়া উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে পশুতে এবং পশু হইতে মানবে পরিণত হইবে। তারপর মানব ক্রমশঃ ঋষি, দেবতা, মনু, প্রজাপতি প্রভৃতির পদ লাভ করিয়া বহু বহু কল্পান্তে একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবেন এবং ব্রহ্মাণ্ডপতি তদপেক্ষা উচ্চতর ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিবেন। ক্ষুদ্র ও উচ্চ জীবের মধ্যে প্রভেদ এই যে ক্ষুদ্রে যাহা অস্ফুট ও অব্যক্ত,—যাহা কেবল বীজভাবে ( potentially ) রহিয়াছে, উচ্চে তাহাই অপেক্ষাকৃত সুব্যক্ত, বিকাশপ্রাপ্ত ও সক্রিয়রূপে ( actually ) বর্ত্তমান। একই ব্রহ্মে সকল জীব ভাসিতেছে, একই ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে বিরাজিত। তবে ঈশ্বর এক অসীম অগ্নিকুণ্ড, জীব এক স্ফুলিঙ্গ, ঈশ্বর একটি সমুদ্র, জীব এক জলবিন্দু। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করা, এই বিন্দুকে সিন্ধু করা,—ইহাই ক্রমোন্নতি,—ইহাই জীবের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন।

অন্যান্য জীবের কথা ছাড়িয়া আমরা কেবল মানব জাতির কল্যাণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। মানবের কল্যাণ কি এবং কিরূপেই

বা উহা সাধিত হইতেছে? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাংখ্যাচার্য্যগণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন—দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম কল্যাণ। দুঃখ ত্রিবিধ,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পীড়াই আধ্যাত্মিক দুঃখ, অন্যান্য প্রাণী হইতে আমরা যে ক্লেশ পাই তাহাই আধিভৌতিক এবং শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি ঝড় ভূমিকম্প বজ্রপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহার নাম আধিদৈবিক। যিনি জীবের এই সকল দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারেন তিনিই পরম কল্যাণ কারক।

এই নিবৃত্তির তারতম্য আছে। নিবৃত্তি আংশিক বা পূর্ণ হইতে পারে, ক্ষণিক বা চিরস্থায়ী হইতে পরে। নিবৃত্তি যতই দীর্ঘকালব্যাপী হয়, কল্যাণের পরিমাণ ততই অধিক। একটি দারিদ্র্যপীড়িত অনশন-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমি একদিন উত্তমরূপে ভোজন করাইলাম। ইহাতে তাঁহার দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইল বটে কিন্তু পরদিবস তিনি আবার ক্ষুধায় কাতর হইবেন। আমি যদি তাঁহাকে এক বৎসরোপযোগী ভক্ষ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি দান করি, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভোজ্যাদি নিঃশেষ হইলে তিনি পুনরায় অনাহারে ক্লেশ পাইবেন। উক্তরূপে দান না করিয়া, মনে করুন তাঁহার একটি চাকুরি করিয়া দিলাম—তাঁহাকে এরূপ একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলাম যদ্দ্বারা তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া দীর্ঘকাল গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দান অপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিক কল্যাণ করা হইল। আবার চাকুরির পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া দেওয়া হয়,—যদি তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির এরূপ উন্মেষ ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিতে পারি যে তিনি যে কোন স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা

অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও অপরের প্রভূত উপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আরও অধিক কল্যাণ করা হইবে।

এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ইহা দেখিয়া আপনার দয়ার উদ্রেক হইল। আপনি ভাল চিকিৎসক আনাইয়া এবং ঔষধাদি ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া তাহাকে জ্বরের সেই আক্রমণটি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে তাহার যথেষ্ট উপকার হইল বটে কিন্তু ম্যালেরিয়াবিষ যাহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ জ্বরভোগ অনিবার্য্য এবং ঐ ব্যক্তি যে স্থানে বাস করিতেছে তাহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ইহা চিন্তা করিয়া আপনি উক্ত ব্যক্তিকে এক স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা তাহার অধিক উপকার করা হইল। কিন্তু ইহাতেও আপনি সন্তুষ্ট না হইয়া তদ্দেশবাসী ও তদবস্থ সকলের দুঃখেই কাতর হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "আহা, ইহাঁরা কিরূপ শীর্ণদেহ, মলিনকান্তি, উদ্যমহীন ও অল্পায়ুঃ হইয়া যাইতেছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ইহাঁদিগকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া এবং দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্য বাড়াইয়া কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে! হায়, হায়! কবে ইহাঁরা সুস্থ, সবল, উদ্যোগী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিবেন।" এইরূপে ইহাঁদের দুঃখমোচনে কৃতসংকল্প হইয়া আপনি দেশের গণ্য, মান্য, ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট আপনার মনোবেদনা জানাইয়া সমগ্র জীবন বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে যে অর্থ সংগ্রহ করিলেন তদ্দ্বারা উক্ত দেশে উত্তম পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়া ঐ স্থানটি ম্যালেরিয়া মুক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য এই কল্যাণটি প্রথম দুই কল্যাণ অপেক্ষা অনেক অধিক ও উচ্চ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে কল্যাণটি যতই স্থায়ী হয় এবং যতই অধিক সংখ্যকের উপর প্রসারিত হয়, তাহা ততই শ্রেষ্ঠ—ততই উচ্চ। ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ অপেক্ষা গ্রামের কল্যাণ শ্রেষ্ঠ, গ্রামের কল্যাণ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ এবং দেশের কল্যাণ অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ শ্রেষ্ঠ। এই লোকহিতকর কার্য্যে কত মহামনাঃ পুরুষ সমগ্র জীবন অতিপাত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য সাহায্যভাণ্ডার ( Relief fund ) খুলিয়াছেন, কেহ কেহ কৃষি বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কেহ বা অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব নিবারণের জন্য জলসেক ও জল নির্গমনের যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতেছেন। অসহায়, আতুর ও পীড়িতদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয়দিগের কল্যানার্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা, গমনাগমনের সুবিধার জন্য বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যানাদির সৃষ্টি, ঝড় বৃষ্টি হইতে সহস্র সহস্র জলযাত্রীর জীবন রক্ষার্থ বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কার, রোগের উপশম ও শান্তির জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের (প্রধানতঃ পাশ্চাত্য অস্ত্র চিকিৎসার) সবিশেষ উন্নতি, রাজার অত্যাচার ও অবিচার নিবারণের জন্য প্রজাসমিতি গঠন, অঙ্গার খনির দুভাগ্য শ্রমজীবীদিগের প্রাণরক্ষার্থ নিরাপদ্ আলোকের ( Safety Lamp এর ) আবিষ্কার, গৃহাদিতে বজ্রপাত নিবারণের জন্য তড়িদ্দণ্ডের ( Lightning rod এর ) সৃষ্টি, এবং সর্ব্বোপরি অসংখ্য নরনারীকে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ করিয়া জগতের হিতসাধনে সক্ষম করিবার জন্য দেশে দেশে—গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন—এই সমস্তই মানবের স্বাভাবিক দয়া ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তির জাজল্যমান নিদর্শন।

এ গুলি জীবের কল্যাণ বটে, কিন্তু পরম কল্যাণ নহে। ইহাদের

উপর আর এক কল্যাণ আছে যাহার কাছে ইহারা ছোট হইয়া যায়,—দিবালোকে খদ্যোতের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রতীচ্য জড়বাদি-দিগের নিকট এই গুলিই কল্যাণের চরম আদর্শ। যাঁহারা আত্মা, পরলোক বা জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না অথবা অজ্ঞেয় বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা স্থূল দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানই মানবের চরম লক্ষ্য বলিবেন বই আর কি? ভাল, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই করা যায় যে জন্মান্তর প্রভৃতি নাই এবং ইহজীবনই মানবের চরম, জিজ্ঞাসা করি তাঁহাদের তথা কথিত সভ্যতা দ্বারা মানবের ইহজীবনেরই দুঃখসমষ্টি কমিতেছে কি? যখন যানাদি ছিলনা তখন মানব পদব্রজে গতায়াত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অতঃপর গোযান, অশ্বযান বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, চক্রযান ( cycle ), ক্রহাম, ফিটন, মোটর প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা জাতীয় যানের আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমশঃ যানারোহণ করা বা এক খানি যান রাখা ("Keeping a Gig") সমাজে একটি ফ্যাসন্ হইয়া উঠিল। প্রয়োজন না থাকিলেও যিনি একখানি যান রাখিতে অথবা যানারোহণ করিতে না পারিতেন, তিনি আপনাকে দুর্ভাগ্য মনে করিতে লাগিলেন। এই ব্যধি প্রথমে ধনীদিগকে আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ মধ্যবিৎ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হইতে লাগিল। আবার, যাঁহার পাল্কী গাড়ী হইল, তিনি একখানি ফিটনের লালসা করিতে লাগিলেন, যাঁহার ফিটন হইল, তাঁহার "একখানি মোটর না হইলে আর চলে না।" কেবল যান সম্বন্ধে যে এই কথা, তাহা নহে। তাঁহাদের সভ্যতানুমোদিত পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, আসবাব প্রভৃতি অধিকাংশ বস্তুরই এই দশা। একটি অভাব মোচন করিতে গিয়া সেই স্থানে রক্তবীজের ঝাড়ের ন্যায় সহস্র নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে,—যেখানে সন্তোষ ছিল আজ সেখানে অসন্তোষ-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া

জ্বলিতেছে!! অবশ্য, ইহাদের দ্বারা মানবের যে আদৌ উপকার হইতেছে না এ কথা আমি বলিতেছি না, বরং ইহাঁদের উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তিকে আমি অন্তরের সহিত নমস্কার করি। তবে আমার বক্তব্য এই যে ইহাঁরা যে উপায়ে মানবের দুঃখবিমোচনে সচেষ্ট, সে উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব। দুঃখরূপ বৃক্ষ বিনাশ করিতে হইলে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা চাই; ইহাঁরা কেবল দু একটি শাখা ছেদন করিতেছেন মাত্র।

দুঃখের মূল কি? প্রতীচ্য ভূভাগে ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচ্যদেশে (বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে) ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রশ্ন সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন অজ্ঞানই দুঃখের মূল। এই অজ্ঞান বশতঃ মানব আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করিয়া ফলে আসক্ত হয়। এই আসক্তিই তাহার ভব-বন্ধনের কারণ। এই বিষয়-তৃষ্ণা বশতঃই তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ এবং আনুসঙ্গিক ক্লেশভোগ (রোগ, শোক, জরা, মরণাদি) ঘটিয়া থাকে। অতএব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিতে হইলে তাহার অজ্ঞানটি নাশ করিতে হইবে, তাহার আসক্তিকে উন্মূলিত করিতে হইবে। "আমি অজর, অমর, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, মনন প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক কর্ম্ম আমি করি না, প্রকৃতিই সব করিতেছে"—এই জ্ঞান যখন তাঁহার দৃঢ়, অটল ও নিত্য অনুভূতির বিষয় হইবে, তখন তিনি সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, জন্মমৃত্যু ও পাপপুণ্যের অতীত হইবেন, তখন তিনি

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, সদানন্দ ও স্বাবলম্বী (আত্মস্থ) হইবেন, তখন তিনি

যাবতীয় কর্ম্ম করিলেও কিছুই করিতেছেন না, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, শোকের পরপারে গিয়াছেন।

অতএব এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উন্মেষ সাধনই মানবের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ। কারণ, কোন ব্যক্তির রক্ত দূষিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষত রোগ জন্মিলে ক্ষত স্থানে প্রলেপাদি দ্বারা সাময়িক উপকার হইলেও, যেমন রক্তশোধক ঔষধ ভিন্ন রোগের মূল বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের উপায়ে মানবের কোন কোন দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে না। যতদিন বাসনা-বিষ অন্তরে থাকিবে, ততদিন অভাব-বিস্ফোটক দেখা দিবেই দিবে: আপনি বৈজ্ঞানিক মলমে একটি আরাম করিবেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানে শতটি স্ফীত হইয়া মাথা তুলিবে, কারণ ভিতরে যে গলদ রহিয়াছে।

পার্থিব ধন রত্ন বিভব-ঐশ্বর্য্য যশঃ মান প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা লক্ষগুণে তীব্র স্বর্গীয় সুখ আপাত-মধুর এবং স্বভাবতঃ রমণীয় বটে, কিন্তু অনিত্য ও নশ্বর; ভোগাবসানে দুঃখ অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য হইলেও, একবার লাভ করিতে পারিলে দুঃখ-রজনীর চির-অবসান হয়। এই জন্যই উপনিষদ প্রথমোক্ত গুলিকে প্রেয়ঃ এবং শেষোক্তটিকে শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। নচিকেতা নামে এক ব্রাহ্মণকুমার পিতার আদেশে যম-ভবনে গিয়া ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকেন। যমরাজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন "কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ বলেন থাকে না। এই সম্বন্ধে উপদেশ দিন।" যম বলিলেন "ইহা বড় কঠিন বিষয়, অনেক দেবতাও ইহা সম্যক্ জানেন না। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তোমাকে সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস দাসী, অতুল ঐশ্বর্য্য,

বিস্তৃত সাম্রাজ্য—এমন কি চিরজীবন এবং স্বর্গের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুও দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি অন্য যা চাহিবে তাহাই পাইবে, কেবল মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।" নচিকেতা টলিলেন না,—ধীর-ভাবে উত্তর করিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

অর্থাৎ, "অন্তক, তোমার প্রস্তাবিত বস্তুগুলি অনিত্য (কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ) এবং উহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট করে। আর আমাদের সমগ্র জীবনও অতি অল্প। অতএব তোমার রথ, অপ্সরাঃ, নৃত্যগীতাদি তোমারই থাক (ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই)।" নচিকেতা প্রেয়ঃ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ আশ্রয় করিলেন। নচিকেতার অবস্থায় পড়িয়া আমাদের মধ্যে কয়জন ঐরূপ বলিতে পারি? সে যাহা হউক, প্রতীচ্য জগৎ আমাদিগকে এই প্রেয়ঃ লাভে সহায়তা করিতেছেন মাত্র এবং প্রাচ্য ঋষিগণ শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন। একজন তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতেছেন, অন্যজন ভবিষ্যতে আর তৃষ্ণার উদ্রেক না হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন; একজন যুদ্ধে আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছেন, আর এক জন যুযুৎসুর প্রেম ও করুণাকে জাগাইয়া যুদ্ধ প্রবৃত্তিই নির্ম্মূল করিতেছেন। উভয়েই মানবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন সত্য, কিন্তু একটি কল্যাণ ক্ষণিক, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অপরটি মহান্ চিরস্থায়ী—অসীম।

জীবের এই পরম কল্যাণদাতৃগণ কোথায় ও কিরূপ? এই করুণা-সাগর ত্রিকালজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ (যাঁহাদের বর্ণনা পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়) প্রকৃত আছেন কি? না, কবির কল্পনা মাত্র? ইঁহারা প্রকৃতই আছেন। তুমি আমি যেরূপ প্রকৃত (real) ইঁহারা

সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক প্রকৃত। ইহা আমার মনঃকল্পিত কথা নহে; যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি আজও (এই বিংশ শতাব্দীতে) মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শ ও আলাপে কৃতার্থ হইতেছেন, ইহা তাঁহাদেরই কথা। সে যাহা হউক, পূর্ব্বকল্পে বা মন্বন্তরে ইঁহারা আমাদিগের ন্যায় জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীবই ছিলেন, ক্রমোন্নতির দ্বারা অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের এই দুঃখ সন্তপ্ত অসহায় ক্ষুদ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে সংসারসাগরে নিমজ্জিত রাখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে স্বীয় উচ্চধামে চিরশান্তি ভোগ করিবেন কি? না, তাহা পারেন না, তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে—তাঁহাদের করুণা সাগর উদ্বেলিত হয়। তাই তাঁহারা নামিয়া আসেন, জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ভূলোকে (অথবা ইহার সন্নিকটস্থ ভুবঃ বা স্বর্গলোকে সূক্ষ্মদেহে) বিরাজ করেন। পাঠক! কি অসীম করুণা, কি বিপুল স্বার্থত্যাগ একবার ভাবিয়া দেখুন! স্বার্থত্যাগই বা বলি কেন? আমাদের চক্ষে ত্যাগ বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা না করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না। জগতের যেখানে যত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, সমস্তই ইঁহাদিগের দ্বারা। ইঁহারাই সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও শক্তি সঞ্চারক। ইঁহারাই থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রকৃত স্থাপয়িতা ও রক্ষক। যবনিকার অন্তরাল হইতে ইঁহারাই সোসাইটিকে মোটামুটি পরিচালিত করেন; অলকট, ব্লাভাটস্কি, বেসান্ত প্রভৃতি ইঁহাদেরই নির্দেশ বা সম্মতি অনুসারেই কার্য্য করিয়াছেন।* থিওসফিক্যাল সোসাইটি জগতে এক অভিনব বস্তু

* বিশেষ বিবরণ Old Diary Leaves এবং সোসাইটির Report প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

নহে, ইহা চিরপ্রবহমান অন্তঃসলিল আধ্যাত্মিক স্রোতের একটি সাময়িক উৎসমাত্র। যদি (ভগবান্ না করুন) মেম্বারগণের অযোগ্যতাহেতু এই উৎসটি কোন কালে রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্তঃস্রোতের বেগ রুদ্ধ হইবার নহে; উহা অন্য স্থানে (যোগ্যতর ক্ষেত্রে) ফুটিয়া বাহির হইবে এবং শীতল বারিদানে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণাতুর ভব পথিকের শান্তি বিধান করিতে থাকিবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন (প্রকৃতই এইরূপ আপত্তি শুনিয়াছি) "ভাল, মহাত্মারা আছেন যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু তোমরা বলিতেছ তাঁহারা প্রায়ই সূক্ষ্মদেহে থাকেন, অথবা স্থূলদেহে থাকিলেও বিজন অরণ্যে বা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে বাস করেন, অথচ তাঁহারাই জগতের কল্যাণকারক! ইহা কিরূপে সম্ভব? যাহারা মানবসমাজে কখনও আসেন না, তাঁহারা মানবের উপকার করিতেছেন কিরূপে?" ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মহাপুরুষগণ স্বভাবতঃ প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জনসমাজে যে কখনও আসেন না তাহা নহে। প্রয়োজন হইলেই আসিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ মানব তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না। আর না আসিলেও তাঁহারা যে জগতের কোন সংবাদ রাখেন না বা উপকার করিবার ভিন্ন প্রণালী নাই ইহা মনে করা আমাদের অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। সূক্ষ্মদেহে থাকিয়া অথবা অজ্ঞাত পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়াও কিরূপে জগতের হিতসাধন করা যায়, অধুনা আমরা সংক্ষেপে তাহারই একটু আভাস দিব। ইহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্মদেহের দু একটি কথা বুঝা প্রয়োজন।

আমরা সাধারণতঃ তিনটি পদার্থ বা পদার্থের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই—কঠিন, তরল, বায়ব। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ইথার (Ether) নামে আর এক প্রকার পদার্থ আছে। উহা বায়ু অপেক্ষা সহস্র সহস্র

গুণে সূক্ষ্ম ও লঘু—এরূপ সূক্ষ্ম যে প্রস্তর, জল প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থের মধ্য দিয়া উহা অবাধে যাতায়াত করে। ইহাই জড়বিজ্ঞানের সীমা। কিন্তু যেখানে জড়বিজ্ঞানের শেষ সেইখানে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের ( occult science এর ) আরম্ভ। এই সূক্ষ্মদর্শিগণ বলেন বৈজ্ঞানিকদিগের ইথারটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ইথার। ইহা ব্যতীত আরও তিনটি ক্রমসূক্ষ্ম ইথার আছে। এই সাতটি পদার্থ ( বা একই পদার্থের সাতটি অবস্থা ) কঠিন, তরল, বায়ু এবং চারিটি ইথার—ভূলোকের বা physical plane এর অন্তর্গত—এই সাতের সংযোগেই স্থূল জগৎ উৎপন্ন। এই সাতটির নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। কিন্তু ইহাই যে জগতের বা পদার্থের শেষ, তাহা নহে। সূক্ষ্মতম ইথার অপেক্ষা সহস্র গুণে সূক্ষ্ম এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাই অপ্‌তত্ত্ব। যেমন ইথার যাবতীয় স্থূল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ এই অপ্‌তত্ত্ব ইথারের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ক্ষিতিতত্ত্বের ন্যায় অপ্‌তত্ত্বেরও ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে সাতটি শ্রেণী বা বিভাগ আছে। এবং সাতটি অপ্‌তত্ত্বের সংযোগে যে লোক বা ভুবন নির্ম্মিত তাহার নাম ভুবঃ লোক ( Astral plane )। ইথার যেমন পৃথিবীর মধ্যেও আছে এবং চতুর্দ্দিকেও আছে সেইরূপ এই ভুবর্লোক ভূলোকের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। আবার অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সূক্ষ্ম যে পদার্থ তাহার নাম তেজস্তত্ত্ব। এই তেজস্তত্ত্বেরও সাতটি বিভাগ এবং তদ্দ্বারা যে ভুবন নির্ম্মিত তাহাই স্বর্লোক বা স্বর্গ ( Mental plane )। এই স্বর্গলোক ভুবর্লোকের ভিতরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঠিক এইরূপে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোকচতুষ্টয় ক্রমসূক্ষ্মতানুসারে একটির মধ্যে অপরটি বিদ্যমান আছে। ভূ, ভুবঃ, স্ব, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি লোক লইয়াই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড।

ভূলোকের ন্যায় এই উচ্চতর লোকগুলিও জীবপূর্ণ। কোনটিই জীবশূন্য নহে। তবে ভূলোকস্থ জীবের দেহ যেমন ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ ভুবর্লোকের জীবের দেহ অপ্‌তত্ত্বে এবং স্বর্লোকের দেহ তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। ভুবর্লোকের ও স্বর্গের অধিবাসীগণ হয়ত আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অথবা আমাদের দেহের মধ্য দিয়া নিয়ত গতায়াত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ দেবগণ এবং পিতৃগণ ভুবর্লোকে বাস করেন এবং বসু রুদ্রাদি উচ্চ দেবতাগণ স্বর্গের অধিবাসী। প্রেতগণ (মৃত মানব) প্রথমে ভুবর্লোকে বাস করেন। এখানকার ভোগ শেষ হইলে স্বর্গে যান এবং পুণ্যের তারতম্যানুসারে অল্পাধিক কাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চতর লোকগুলিতেও উচ্চতর জীব বাস করেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ইহাঁদের নামোল্লেখ আছে। যথা ঋভু, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ আদি মহর্লোকে বাস করেন, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক এবং অমরগণ জনলোকে, আভাস্বর, মহাভাস্বর প্রভৃতি তপঃলোকে এবং অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস ও সত্যাভাসগণ সত্যলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক জীবের অনেকগুলি দেহ আছে। উদাহরণস্বরূপ একটি মানবকে গ্রহণ করা যাউক। প্রথমতঃ তাঁহার স্থূল দেহ। ইহা ক্ষিতিতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দেহের মধ্যে (এবং ইহার চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত) আর একটি দেহ রহিয়াছে। ইহার নাম বাসনা-দেহ (Desire-body)। ইহা ডিম্বাকৃতি এবং অপ্‌তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। আবার এই বাসনা-দেহের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে। ইহাকে তাঁহার ভাবনা-দেহ (Thought-body) বলা যাইতে পারে। ইহা তেজস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে। মানব

যতই উন্নত (developed) হয়, তাঁহার এই সূক্ষ্মতর বা উচ্চতর দেহগুলি ততই সুগঠিত ও কার্য্যক্ষম হইতে থাকে। মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় বাসনা-দেহ সকলেরই সুগঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল খুব চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরই ভাবনা-দেহটি সুনির্ম্মিত ও কর্ম্মক্ষম। বেদান্তে এই দেহগুলিকে কোষ বলা হইয়াছে যথা অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ ইত্যাদি। সে যাহাহউক, যে দেহটি যে তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত তাহা তত্তৎ লোকের জ্ঞান লাভের পক্ষেই উপযোগী, অর্থাৎ ভূলোকের জ্ঞান লাভ করিতে স্থূলদেহ আশ্রয় করিতে হয়, ভুবর্লোকের অভিজ্ঞতার জন্ম বাসনা-দেহের প্রয়োজন ইত্যাদি। এক্ষণে মানব কিরূপে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাই দেখিব।

প্রথমতঃ স্থূল জগতের কথা। আমি বসিয়া আছি; গৃহপতনের এক ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিরূপে শব্দজ্ঞান জন্মিল? পতিত গৃহের ইষ্টকাদির ঘাত প্রতিঘাতে যে প্রবল কম্পন বা স্পন্দন উদ্ভূত হইল উহাদ্বারা সংস্পৃষ্ট বায়ু কম্পিত হইল এবং এই কম্পন বায়ুর স্তর হইতে স্তরান্তরে পরিচালিত হইয়া আমার কর্ণপটাহে আঘাত করিল। পটাহ-সংলগ্ন স্নায়ু অনুরূপ কম্পিত হইয়া উক্ত কম্পনকে আমার মস্তিষ্কে আনিলে আমার শব্দ জ্ঞান হইল। শব্দ সম্বন্ধে যে নিয়ম, দর্শন, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদ সম্বন্ধেও ঠিক তাই,—অর্থাৎ বাহ্যজগতের স্পন্দন আমাদের দেহে অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিলে আমাদের জ্ঞান জন্মে। অবশ্য, স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই অসংখ্য স্পন্দন বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি যত অধিক গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার তত অধিক জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম জগতেও ঠিক এই নিয়ম। স্থূল দেহ যেরূপে ক্ষিতিতত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করে, সেইরূপে বাসনা-দেহ অপ্‌তত্ত্বের এবং ভাবনা—দেহ তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন গ্রহণ করিয়া থাকে।

তবে একটি প্রভেদ এই যে স্থূলদেহের কম্পন কেবল রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দরূপে অনুভূত হয়, কিন্তু বাসনা-দেহের স্পন্দন এক একটি বাসনা বা কামনা রূপে এবং ভাবনা-দেহের স্পন্দন এক একটি চিন্তারূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ বাসনা দেহের এক একটি স্পন্দনই এক একটি স্বতন্ত্র কামনা। যেমন আমার নেত্র পটাহের ( Retinaর ) একপ্রকার স্পন্দনের নাম লাল বর্ণ, আর এক প্রকার স্পন্দনের নাম পীতবর্ণ ইত্যাদি, সেইরূপ আমার বাসনা-দেহের এক রকম স্পন্দনের নাম কাম, অন্য প্রকার স্পন্দনের নাম ক্রোধ ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনা-দেহের এক একটি পৃথক স্পন্দনই আমাদের এক একটি পৃথক চিন্তা।

আবার মনে করুন আমি উচ্চস্বরে একটি কথা বলিলাম। আমার চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গ উহা শুনিতে পাইলেন। কিরূপে শুনিলেন? আমার জিহ্বা, কণ্ঠ, ওষ্ঠাদির সঞ্চালন তৎসংলগ্ন বায়ুকে কম্পিত করিল এবং এই কম্পন বায়ুর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কর্ণ-পটাহে অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করাতে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। আচ্ছা, আমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইলে কি হয় দেখা যাউক। ক্রোধের উদয় মাত্রই আমার বাসনা-দেহ একটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই স্পন্দন অপ্‌তত্ত্বের স্তর হইতে স্তরান্তরে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ আমার চতুঃপার্শ্বস্থ ভুবর্লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অপরের বাসনা-দেহে আঘাত করিয়া ঠিক অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিল। ইহার ফল কি? তাঁহাদের মনেও ক্রোধের উদ্রেক হইল। ক্রোধের পক্ষে যে নিয়ম, আমাদের যাবতীয় বাসনা ও চিন্তার পক্ষেও ঠিক তাই। আমাদের মনে লোভের উদ্রেক করিয়া আমরা অন্যের লোভপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া দিতেছি, নিজে হিংসা করিয়া জগতের হিংসা বাড়াইতেছি, অথবা হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম আনিয়া অপরের সূক্ষ্মদেহে

ভক্তি ও প্রেমের স্পন্দন উৎপাদন করিতেছি। অতএব "যিনি একটি কুচিন্তা অন্তরে পোষণ করেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহারই অনিষ্ট এবং (যদবধি উহা প্রকাশ না করেন) জগতের কোন অনিষ্ট হয় না"—এই ধারণাটি বিষম ভ্রমপূর্ণ। আমরা প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্তে অপবিত্র ও মন্দচিন্তার দ্বারা জগতের যে কত অনিষ্টসাধন করিতেছি (অথবা সুচিন্তাদ্বারা কল্যাণ বিধান করিতেছি) তাহার ইয়ত্তা নাই। সুচিন্তা-দ্বারা প্রত্যেক মানব অজ্ঞাতসারে ও ক্ষীণভাবে স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে যাহা করিতেছেন, মহাপুরুষগণ জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং প্রবলভাবে সমগ্র জগতের উপর তাহাই সাধন করিতেছেন।

এই সূক্ষ্মদেহগুলির স্পন্দন মানবের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হয়। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হয়, তিনি যতই একাগ্রভাবে ও অধিককাল একটি বিষয় চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহার সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন ততই প্রবল, স্থায়ী ও প্রসারিত হয়। যদি তীব্র ইচ্ছার সহিত তিনি দূরস্থ কোন বন্ধুকে কোন চিন্তা পাঠাইতে সঙ্কল্প করেন, তাঁহার ভাবনা-দেহের স্পন্দন অন্তবর্ত্তী তেজস্তত্ত্ব ভেদ করিয়া সেই দিকেই ছুটিবে এবং বন্ধুর ভাবনা-দেহে অনুরূপ স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তচ্চিত্তে ঐ চিন্তাটির উদ্রেক করিয়া দিবে। ইহাই Thought-transference বা চিন্তাচালনার রহস্য। সে যাহাহউক, মহাত্মাগণ বিশাল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, শান্তি, ক্ষমা, সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি ভাব ও চিন্তা অন্তরে নিয়ত পোষণ ও চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহারা সূক্ষ্মজগতে যে বিরাট স্পন্দন উৎপাদন করিতেছেন, তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইতেছে ও হইবে ইহা কি বিচিত্র? অতএব নিভৃত শৈলশিখরেই বাস করুন বা পৃথিবীর কোন স্থানে বাস নাই করুন, তাঁহারা জীবের

জন্য যাহা করিতেছেন আমরা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও আমাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারি না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "আচ্ছা, মহাপুরুষগণ যদি নিয়তই আধ্যাত্মিক, স্পন্দন উৎপাদন করিতেছেন, তবে জগতে এখনও এত হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রহিয়াছে কেন?" ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, "প্রস্তরের সমীপে যদি আপনি একটি সুমিষ্ট গান করেন, অথবা বৃক্ষের সম্মুখে যদি একখানি সুন্দর ছবি ধরেন, প্রস্তর উহা শুনিতে এবং বৃক্ষ দেখিতে পায় কি?" বায়ুর এবং ইথারের উক্ত স্পন্দন উহারা গ্রহণ করিতে অক্ষম। কেন? কারণ, উহাদের গ্রহণোপযোগী যন্ত্র ( Receiving instrument ) এখনও জন্মে নাই— বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। ঠিক সেইরূপে অনেক মানবেরই সূক্ষ্মতর দেহগুলি ( বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ ) এখনও সুগঠিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই সকল আধ্যাত্মিক স্পন্দন হয়ত আদৌ গ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জীবের কল্যাণ সাধন করিবার মহাপুরুষগণের অসংখ্য প্রণালী আছে। আমরা কেবল একটি প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম মাত্র। সে যাহাহউক, উপসংহারে "থিওসফিষ্ট" কাহাকে বলে তাহারই একটু আভাস দিব। অনেক পাঠক "থিওসফি"—এই বৈদেশিক শব্দটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াই তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত বলা প্রয়োজন যে যিনি জীবের যত অধিক কল্যাণ করেন, তিনি ততই অধিক থিওসফিষ্ট। যিনি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম যতই বুঝিয়াছেন, যিনি জগতের রহস্য যত অধিক উদ্ঘাটন করিয়াছেন, যিনি জীবের ক্রমোন্নতি-তত্ত্ব যতই সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং ( এই

সকল বুঝিয়া ও জানিয়া) যিনি যত অধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থটিকে বলি দিতে পারেন,—যতই অধিক পরিমাণে জীবের কল্যাণোদ্দেশে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি (যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, যে দেশেই থাকুন, অথবা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন) ততই অধিক থিওসফিষ্ট। এই অর্থে, জীবন্মুক্ত ঋষিগণ সর্ব্বোচ্চ ও আদর্শ থিওসফিষ্ট। কারণ তাঁহাদের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন কে? এবং কেই বা তাঁহাদের ন্যায় জগৎ-রহস্য বুঝিতে ও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম? জীবের কল্যাণই বা বলি কেন। তাঁহাদের চক্ষে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র জীব নাই, সবই "আমি"। তাঁহাদের "আমিত্ব" ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, উহা প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগৎকে স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে। সুতরাং জগতের কল্যাণই তাঁহাদের নিজের কল্যাণ, জগতের দুঃখই তাঁহাদের নিজের দুঃখ! অতএব জীবের জন্য যে তাঁহারা জীবকে ভাল বাসেন তাহা নহে, "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" সাধারণ মানব "আমার" বলিতে নিজদেহটুকু অথবা জোর নিজ পরিবারটিকেই বুঝেন, কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিরাট ব্রহ্মাণ্ডই মহাপুরুষদিগের "আমার"। এই জ্ঞান,—এই প্রেমই সকল ধর্ম্মের আদর্শ এবং ইহারই নাম থিয়সফি।

# পরিশিষ্ট ( গ )

ও

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বিরাজিত। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নর বানর চন্দ্র সূর্য্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি তৎসমুদায়েই তিনটি শক্তি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। মনে করুন কতকগুলি পরমাণু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ক্রমশঃ তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া গতিযুক্ত হইল এবং অবশেষে দুইটি দুইটি মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকরূপে প্রকাশ পাইল। এখানে তিনটি শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। যে শক্তিদ্বারা তাহারা বিক্ষিপ্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহা এক শক্তি, যদ্দ্বারা আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইল তাহা আর এক শক্তি, এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা নূতনরূপে বা আকারে প্রকাশিত হইল তাহা তৃতীয় শক্তি। প্রথম শক্তিটীর নাম তমঃ, দ্বিতীয়টির নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ত্ব। আপনি কতকটা হাইড্রোজেন ও কতকটা অক্সিজেন আনিয়া এক পাত্রে মিশাইলেন। কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হইল না; ইহা দেখিয়া তন্মধ্যে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত করিলেন। ফল কি হইল? একটা নূতন পদার্থের আবির্ভাব। তমঃ প্রভাবে বাষ্পদ্বয় মিলিতে পারিতেছিল না। তড়িৎ প্রবাহদ্বারা যেমন রজঃ প্রবল হইল অমনি সত্ত্ব প্রভাবে জলের প্রকাশ হইল। দিয়াসালাইএর একটি কাঠিতে তমঃ প্রভাবে অগ্নি সুপ্ত রহিয়াছে। ঘর্ষণ দ্বারা রজের উদ্রেক করিবামাত্র সত্ত্বের প্রবলতা হেতু অগ্নি প্রকাশিত হইল। একটি তানপুরার তারে শব্দ প্রচ্ছন্ন আছে। অঙ্গুলির মৃদু

আঘাতরূপ রজোগুণ প্রবল হইবামাত্র তমঃ পরাভূত হইয়া সত্ত্বপ্রভাবে শব্দ প্রকাশ পাইল।

সর্ব্বত্রই সকল পদার্থে তিনটি শক্তি আছে। তবে কোনটিতে তমঃ প্রবল, কাহাতে বা রজঃ প্রবল এবং কাহাতে বা সত্ত্ব প্রবল। রজঃ প্রবল হইয়া তমকে এবং সত্ত্ব প্রবল হইয়া রজকে পরাভূত করে। তমের পর রজঃ, রজের পর সত্ত্ব। আবার সত্ত্বের পর তমঃ, তমের পর রজঃ, রজের পর সত্ত্ব। এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে। যতদিন সৃষ্টি ততদিন এই ক্রম অব্যাহত আছে ও থাকিবে। একটি বীজে তমঃ প্রবল; সুতরাং ভবিষ্যৎ বৃক্ষটি উহাতে অব্যক্ত ও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মাটিতে পুতিলে উহার রজঃ শক্তিটি জাগিয়া উঠে এবং তৎপ্রভাবে উহা জল বায়ু প্রভৃতি আকর্ষণ করে। তখন পরমাণুগুলি বিশেষভাবে আন্দোলিত, ক্ষোভিত ও সংযোজিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে সত্ত্ব প্রবল হইয়া একটি অঙ্কুর উৎপাদন করে। যতক্ষণ সত্ত্ব প্রবল থাকে, ততক্ষণ অঙ্কুরটি প্রকাশিত থাকে। যদি সত্ত্ব চিরকাল প্রবল থাকিত, অন্যগুণ প্রাধান্যলাভ না করিত, তাহা হইলে অঙ্কুরটিও চিরকাল ঐ ভাবেই থাকিত, কোনরূপ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইত না। কিন্তু তাহা ঘটে না। যেমন অঙ্কুরটির পূর্ণ বিকাশ হইল, অমনি তমঃ উহার ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এবং একদিকে যেমন উহা অল্পে অল্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অন্যদিকে রজঃ ও সত্ত্ব উহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তিনটি শক্তি পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া অঙ্কুরকে কাণ্ডে, পল্লবগুলিকে শাখা প্রশাখায় এবং পত্রকে পুষ্প পরিণত করে। আবার পুষ্প যদি চিরকালই পুষ্পরূপে থাকে তাহা হইলে ফলের সম্ভাবনা কোথায়? পুষ্পত্বের বিলোপ না ঘটিলে ফলের বিকাশ হইতে পারে না। তাই

তমঃ প্রভাবে পুষ্পটি শুষ্ক হইতে থাকে এবং রজঃ ও সত্ত্ব প্রভাবে ফলের আবির্ভাব হয়। একটি শিশু জন্মিল। শিশুর আবির্ভাব সত্ত্বগুণ সাপেক্ষ। এই সত্ত্ব যদি প্রবল থাকিয়া যায় তাহা হইলে উহার শিশুত্ব ঘুচিবে না। তাই তমঃ শিশুত্বের বিনাশ সাধন করিল এবং রজঃ ও সত্ত্ব পরবর্ত্তী অবস্থা (বালকতা) উন্মেষিত করিয়া দিল। পুনরায় তমের দ্বারা বালকত্বের অপনোদন এবং রজঃ ও সত্ত্বের, দ্বারা যৌবনের বিকাশ। এইরূপে তমঃ রজঃ সত্ত্ব, তমঃ রজঃ সত্ত্ব—ক্রমাগত চলিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে শক্তি কিছু একটা করিতে, গড়িতে বা সৃষ্টি করিতে চায় তাহার নাম রজঃ বা ক্রিয়াশক্তি। যে শক্তি সৃষ্ট বস্তুটিকে প্রকাশিত রাখিতে বা রক্ষা করিতে চায় তাহাই সত্ত্ব বা পালন শক্তি। এবং যে শক্তি বস্তুটিকে বা বস্তুর তদবস্থাকে ছিন্নভিন্ন, বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট করিতে চায় তাহাই তমঃ বা সংহার শক্তি। শাস্ত্র এই শক্তি-ত্রয়কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারাই পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং তন্ত্রের ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী ও কালী। ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

| রজঃ | সত্ত্ব | তমঃ |
|---|---|---|
| ক্রিয়াশক্তি | পালনশক্তি | সংহারশক্তি |
| ব্রহ্মা | বিষ্ণু | শিব |
| ব্রহ্মাণী | লক্ষ্মী | কালী |

বিশ্বের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অনন্তকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে। এই তিরোভাবের নাম প্রলয়। প্রলয়ে ভগবানের এই শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থাতে (in **Equilibrium**) থাকে; অর্থাৎ কোনটির প্রবলতা থাকে না, তিনটি সমান বল সংযুক্ত থাকায় পরস্পর পরস্পরকে

খণ্ডন করে। এই সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। তখন প্রকৃতি ভগবানে বিলীন থাকে। এই অবস্থা যে কিম্ভূত তাহা আমাদের কল্পনা করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই এক এবং অদ্বিতীয় অবস্থায় ভগবান যেমন বহু হইবার ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিটি বা রজোগুণ প্রবল হয় এবং ইহাই অনুলোম ক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূত এবং অসংখ্য জীবসমন্বিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে। যেমন সৃষ্টি হইতে থাকে, অমনি দ্বিতীয় শক্তিটি ( বিষ্ণু ) প্রবল হইয়া সৃষ্ট বস্তুগুলিকে ধারণ বা রক্ষা করিতে থাকেন। যতদিন ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে ততদিন ভগবান এই শক্তিটিকেই ( সত্ত্বকে ) প্রবল রাখিবেন। যখন প্রলয়কাল উপনীত হইবে তখন তিনি সত্ত্বকে দুর্ব্বল করিয়া তমকে ( শিবকে ) প্রবল করিবেন, সুতরাং ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদি প্রতিলোমক্রমে বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সেই অনাদি পুরুষে বিলীন হইবে। তখন তিনি আবার সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। পুনরায় যখন তাঁহার সিসৃক্ষা ( সৃষ্টির ইচ্ছা ) হইবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজঃ ও সত্ত্বকে প্রবল করিয়া বিশ্বাদি রচনা করিবেন এবং প্রলয় সমাগত হইলে তমঃ প্রবল করিয়া সমস্ত সংহার করিবেন। এইরূপ সৃষ্টি ও লয়, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা ( Activity and passivity ) সগুণভাব ও নির্গুণভাব ঘড়ীর পেণ্ডুলমের ন্যায় অনাদিকাল চলিতেছে।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার ব্যাপারে এই ত্রিমূর্ত্তি যেরূপ প্রকটিত, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় ক্ষুদ্র অংশে ইনি সেইরূপই প্রকাশিত; প্রভেদ এই যে সমগ্রে ইনি সমষ্টিভাবে ক্রিয়াশীল, অংশে ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়াযুক্ত। যখন এক রাজমিস্ত্রী এক অট্টালিকা নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া ইষ্টক কাষ্ঠাদি সংগ্রহপূর্ব্বক নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন

তখন তাঁহাতে ব্রহ্মার ভাব প্রবল। অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইলে যখন তিনি আনন্দ বা প্রীতিলাভ করেন, তখন বিষ্ণুভাব প্রবল। এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই ভাবিয়া যখন ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার শিবভাব প্রবল। জীবগণ (বৃক্ষ পশু মানবাদি) জন্মিয়া কেমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইতেছে—ইহাই ব্রহ্মভাব, যৌবন প্রাপ্তি, বিষ্ণুভাব; মলিন, কৃশ ও জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—শিবভাব। শিশু জাগরিত হইয়া আহার অন্বেষণে ধাবিত হইল—ব্রহ্মভাব; উদরপূর্ত্তি হইলে সুখে খেলিতে লাগিল—বিষ্ণুভাব; ক্রমশঃ আলস্য ও তন্দ্রায় অভিভূত হইল—শিবভাব। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন—ব্রহ্মভাব; মধ্যগগনে উপস্থিত হইলেন—বিষ্ণুভাব; অস্তগমনোন্মুখ হইলেন—শিবভাব।—শশিকলার দিনে দিনে বৃদ্ধি (শুক্লপক্ষ)—ব্রহ্মভাব; পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ—বিষ্ণুভাব; দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্তি (কৃষ্ণপক্ষ)—শিবভাব। জীবের ভোগতৃষ্ণা—ব্রহ্মভাব; ভোগে সুখবোধ—বিষ্ণুভাব; ভোগে বিরাগ—শিবভাব। সর্ব্বত্রই ত্রিমূর্ত্তি।

বসন্ত আসিল। মলয় মারুত বহিল। তরুলতা নবপত্র ও পুষ্পে সুশোভিত হইল। বিহগগণ সুস্বরে গান ধরিল। প্রকৃতি বুক ভরা আশা ও উদ্যম লইয়া যেন জাগিয়া উঠিলেন। ক্রমে নিদাঘ আসিল। পুষ্প ফলে পরিণত হইল। পশুপক্ষী নানাপ্রকারে আহার বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু সুখ চিরকাল থাকে না, শীত উপস্থিত হইল। গাছে ফল পুষ্প নাই, পাতাগুলিও শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। বিহগগণ গান ছাড়িয়া কোটরে লুকাইল, প্রচণ্ড শীতবায়ু বহিয়া জীবগণকে শুষ্ক, শীর্ণ ও কাতর করিয়া তুলিল। জগতের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন সব ঘুমাইয়াছে বা মরিয়াছে। আবার সমুদ্রের দিকে দেখুন—ঐ

জোয়ার আসিয়াছে। বিশাল জলধিবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা কত দিক্ দিগন্তে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে কত নদ, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, খাল, বিল, খানা, ডোবা জলে পূর্ণ হইয়া গেল। আহা! প্রকৃতির মূর্ত্তি এখন কেমন জীবন্ত, পূর্ণ, গম্ভীর। আবার একি? জল সরিয়া যাইতেছে কেন? ইহাকেই কি বলে ভাটার টান? হায় হায়! সব যে শুকাইয়া গেল। খানা, ডোবা, নদী, নালা—কোথায়ও এক ফোঁটা জল নাই। প্রকৃতির এমন শীর্ণ, দরিদ্র, মলিন, মৃতপ্রায় অবস্থা তো আর কখনো দেখি নাই। পাঠক! বুঝিয়াছেন তো? এই বসন্তই ব্রহ্মা, নিদাঘ বিষ্ণু, শীত শিব; এই জোয়ারের আরম্ভই ব্রহ্মা, জোয়ারের পূর্ণতা বিষ্ণু, ভাটা শিব।

বাহিরে যেমন, ভিতরেও তেমন। আমাদের মনের মধ্যে এই বসন্ত শীত, এই জোয়ার ভাটা নিয়ত খেলিতেছে। জীবমাত্রই অনুক্ষণ কোন না কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, বাসনা-তাড়িত হইয়া উহার দিকে ছুটিতেছে, উহা লাভ করিয়া ক্ষণিক সুখ বোধ করিতেছে, এবং পরক্ষণেই বিরক্ত হইয়া উহা ত্যাগ করিতেছে। একটি সুন্দর উদ্যান দেখিয়া আমার লোভ জন্মিল। বহু বর্ষ শ্রম করিয়া আমি যে অর্থোপার্জ্জন করিলাম তদ্দ্বারা সেই প্রকার এক বাগান প্রস্তুত করিলাম। কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে, আমি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি রোপণ করিলাম, মধ্যভাগে এক পুষ্করিণী খনন করাইলাম, রাস্তা বাঁধাইলাম, চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করিলাম। বাগানটি সম্পূর্ণ হইলে, কিয়ৎকাল তদ্দর্শনে আমি একটু সুখও বোধ করিলাম। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কেমন একটা বিরক্তি আসিল। যেন আর তাহা ভাল লাগে না, যেন আর তাহাতে সৌন্দর্য্য নাই, তাহা যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। সযত্ন রোপিত বৃক্ষাদি অযত্নে বনজঙ্গলে পরিণত হইল, প্রাচীরটি স্থানে

স্থানে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, পুষ্করিণী আবর্জ্জনাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ জোয়ার ভাটা আমাদের অন্তরে নিয়ত হইতেছে ও হইবে। ইহা লইয়াই সংসার, ইহা লইয়াই জগৎ। যেমন জোয়ারের স্রোত আইসে, অমনি কত বাসনা, কত অনুরাগ, কত আশা, কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত অধ্যবসায় অন্তরে জাগিয়া উঠে, আবার ভাটার টানে সবই শুষ্ক হইয়া যায়, তখন নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ, আলস্য, জড়তা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই জোয়ারকে আমরা সাধারণতঃ "জীবন" এবং ভাটাকে "মরণ" বলি। কিন্তু তাহা না বলিয়া একটিকে প্রবৃত্তি ও অপরটিকে নিবৃত্তি বলাই অধিকতর সমীচীন। ভগবান্ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া যে শক্তি দ্বারা বহির্ম্মুখী হইলেন, সেই বহির্ম্মুখিনী শক্তির নামই প্রবৃত্তি বা রজঃ সত্ত্ব, বা ব্রহ্মা বিষ্ণু বা লক্ষ্মী ; এবং তিনি পুনরায় "এক ও অদ্বিতীয়" হইবার ইচ্ছা করিয়া যে শক্তিদ্বারা অন্তর্ম্মুখী হইলেন, সেই অন্তর্ম্মুখিনী শক্তিই নিবৃত্তি, বা তমঃ, বা শিব বা কালী। প্রবৃত্তির কার্য্য—বহুর সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করা, বহুর দিকে জীবকে টানিয়া আনা ; নিবৃত্তির কার্য্য—বহুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা; একের দিকে তাহাকে টানিয়া আনা। তাই লক্ষ্মীদেবী ধনধান্য পুত্র কলত্রাদি দিয়া আমাদের সংসারটি বজায় রাখিতেছেন, বিকট-বদনা কালী সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিয়া নরমুণ্ড চিবাইতে চিবাইতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন।

কিন্তু দুইটিই চাই,—দুইটি না থাকিলে জীবের—জগতের জন্ম ও উন্নতি হইত না। ব্রহ্মা ও শিব, লক্ষ্মী ও কালী—দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি, তাই দু'য়ের মধ্যে নিত্য বিরোধ, সর্ব্বদা কলহ। জীবসৃষ্টির জন্য প্রজাপতি

দক্ষ যজ্ঞ করিলেন, শিব কতকগুলা ভূত প্রেত লইয়া যজ্ঞ ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই দক্ষ যজ্ঞের অভিনয় জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘটিতেছে। একটি নবজাত বৃক্ষ দক্ষের কৃপায় কেমন হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে দেখিয়া শিব রুষ্ট হইলেন। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে জীর্ণশীর্ণ করিয়া শেষে প্রাণে মারিলেন। শিব তো মঙ্গলময়। তবে এত অত্যাচার করেন কেন? এ গুলি অত্যাচার নহে, কৃপাবৃষ্টি। যদি এ অত্যাচার না হইত, যদি জীব পদে পদে ধাক্কা না খাইত, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি জাগিত কি? আজ যে জীব বৃক্ষরূপে অচেতন-প্রায় রহিয়াছে, ঝড়বৃষ্টিরূপ চাবুক খাইয়া তাহার চৈতন্যের ক্রমোন্মেষ হইতেছে। চৈতন্যটি যখন এরূপ জাগিতেছে যে বৃক্ষরূপ উপাধিতে তাহার আর বিকাশ পাওয়া অসম্ভব, তখন শিব তাহার বৃক্ষ-দেহটি ধ্বংস করিয়া দিতেছেন এবং ব্রহ্মা তাহার জন্য একটি পশুদেহ রচনা করিতেছেন। মনে করুন একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে এক পক্ষিশিশু আবদ্ধ আছে। পাখীটি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল, ক্রমে ঐ পিঞ্জরে তাহার আর স্থান হয় না। খাঁচাটি এরূপ নির্ম্মিত যে তাহার কোন দরজা নাই, সুতরাং না ভাঙ্গিলে পাখীটিকে বাহির করা যায় না। এ স্থলে আপনি কি করিবেন? খাঁচাটি ভাঙ্গিয়া পাখীটিকে বাহির করিয়া অবশেষে এক বড় খাঁচাতে রাখিবেন। ঠিক এইরূপই ঘটিতেছে। শিব নিয়ত খাঁচা ভাঙ্গিতেছেন, ব্রহ্মা নূতন খাঁচা গড়িতেছেন এবং বিষ্ণু ফল মূল দিয়া পাখীটিকে আবদ্ধ রাখিতেছেন। যখন আমার জীবাত্মাটি এরূপ বাড়িয়াছে যে বর্ত্তমান দেহে তাহার আর স্থান হয় না, তখন শিব তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাকেই আমরা বলি "মরণ"। "মরণ" না বলিয়া ইহাকে "উচ্চতর জীবন" বলা উচিত নয় কি?

ব্রহ্মা পিঞ্জর গড়িতেছেন, শিব তাহা ভাঙ্গিতেছেন। ইহাই দক্ষযজ্ঞ।

একটি জীব আজ মানবদেহরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ আছে। সে ক্ষুদ্র দেহটি লইয়াই ব্যস্ত—দেহের সুখেই সুখ, দেহের দুঃখেই দুঃখ বোধ করে। ক্রমশঃ সে বাড়িতে লাগিল, তাহার শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল, প্রেম বাড়িল। তখন ক্ষুদ্র পিঞ্জরে তাহার স্থান হয় না। ইহা দেখিয়া শিব এই পিঞ্জরটিকে ভাঙ্গিয়া দিলেন, ব্রহ্মা পরিবাররূপ নূতন পিঞ্জর গড়িলেন, বিষ্ণু এই নূতন পিঞ্জরটি রক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন জীব পরিবার লইয়াই ব্যস্ত হইলেন, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের সুখেই সুখ এবং তাহাদের দুঃখেই দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জীব আরও বাড়িল,—জ্ঞান ও প্রেম আরও প্রসারিত হইল। পরিবার-পিঞ্জরে তাঁহার স্থান হইল না। সুতরাং স্বদেশ-পিঞ্জর রচিত হইল। এখন তাঁহার সত্ত্বা স্বদেশে মিশিয়া গেল, তিনি সমগ্র স্বদেশ ব্যাপিয়া রহিলেন। স্বদেশের একটি প্রাণী খাইতে না পাইলে তিনি অনাহারক্লেশ বোধ করেন, স্বদেশের পশু পক্ষীগুলিকেও আনন্দিত দেখিলে তিনি আনন্দ লাভ করেন। দেখিতে দেখিতে জীব আরও বাড়িয়া উঠিল, কারণ বৃদ্ধির সীমা নাই। তখন স্বদেশপিঞ্জর অতি সঙ্কীর্ণ বোধ হইল। শিব উহা ভাঙ্গিয়া দিলেন, ব্রহ্মা সমগ্র স্থূল জগৎরূপ পিঞ্জর গড়িলেন। এখন জীবের অবস্থাটি ভাবিয়া দেখুন। তাহার জ্ঞান ও প্রেম সমগ্র স্থূল জগতে প্রসারিত, প্রত্যেক ঘটনাই তিনি জানেন ও বুঝেন, প্রত্যেক জীবই তাঁহার নিজের। সুতরাং তিনি যাহা কিছু করেন,—জগতের জন্য, যাহা কিছু ভাবেন,—জগতের জন্য। জ্ঞান ও শক্তি বাড়িয়া চলিল,—ক্রমশঃ তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুলিল, তিনি ভুবঃ, স্ব, মহ, আদি ভুবন দেখিতে পাইলেন, তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহার আমিত্ব মিশাইয়া দিলেন, তাঁহাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। শিব দেখিলেন স্থূল জগৎরূপ পিঞ্জরে উক্ত জীবের স্থান হইতেছে না,

তাঁহার আয়তন এত বাড়িয়াছে ; সুতরাং উহা ভগ্ন করিলেন এবং ব্রহ্মা এক বিরাট স্থূক্ষ্মোপাধি গড়িয়া দিলেন। এইরূপ বাড়িতে বাড়িতে বহু কল্পান্তে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া উঠিলেন। এখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক স্থানে তিনি বিদ্যমান ; কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডটাই তাঁহার বিরাট দেহ হইয়াছে। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম এতই বাড়িয়াছে যে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব তাহা কল্পনা করিতে পারে না, প্রত্যুত তিনি এখন একটি ব্রহ্মাণ্ডপতি বা ঈশ্বর হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার একটি পিঞ্জর বা উপাধি আছে। ইহাই শেষ উপাধি এবং ইহার নাম মায়া। ইহাকে আর পিঞ্জর বলা যায় না ; কারণ তিনি এখন বদ্ধ নহেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহা ত্যাগ করিয়া অনন্ত "সৎ" এ বিলীন হইতে পারেন।

অনন্ত ব্রহ্মের প্রত্যেক বিন্দু,—প্রত্যেক চিদণুই এক একটি জীব ; এবং প্রত্যেক জীব কোন না কোন কালে এক একটি ঈশ্বরে উন্নীত হইবে। এই ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ সাধনের জন্যই ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব,—সৃষ্টি, পালন ও সংহার। যতকাল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, ততকাল দক্ষযজ্ঞ চলিবে, ততকাল লক্ষ্মী পূজা ও কালী পূজা থাকিবে। প্রত্যেক জীবকে লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা করিতেই হইবে, কারণ ইহা লইয়াই জগৎ, ইহা লইয়াই জীব। যতদিন জীব প্রবৃত্তিমার্গে থাকেন, ততদিন তিনি লক্ষ্মীপূজা করেন,—লক্ষ্মীদ্বারা পরিচালিত হন ; ততদিন ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, স্ত্রী, পুত্র, বিভব, বিলাস, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, প্রজাপতিত্ব প্রভৃতি কামনা করেন এবং প্রাপ্ত হন। কিন্তু কালীর কৃপা হইলে, জীব নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ শ্মশানে পরিণত হয়, তাহাতে কেবল জ্ঞানের ও প্রেমের অগ্নি নিরন্তর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে

থাকে এবং সেই আগুনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দর্প, অভিমান যাবতীয় বিষয়বাসনা ও ভোগ তৃষ্ণা, এমন কি ইন্দ্রত্বাদি লাভের কামনা পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; তখন সেই ভস্মরাশির মধ্যে তিনি একাকী বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে স্বতঃই এই আবাহন গীতি উচ্ছ্বসিত হয়—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান বাসিনী শ্যামা, থাক্‌বে তাহে নিরবধি॥
আর কিছু, মা, নাইকো চিতে, নিরবধি জ্বল্‌ছে চিতে,
ভস্মরাশি চারি ভিতে, রেখেছি মা আসিস্ যদি॥"

সন্তানের এই কাতর ক্রন্দনে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দেন, ভক্তের হৃদয়-শ্মশানে পূর্ণভাবে আবির্ভূতা হন। উঃ কি ভয়ঙ্করী! কি নিষ্ঠুরা!! অথচ কি আনন্দময়ী!!! কোটি যোজন ব্যাপী করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতেছে! দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই। অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, মনু, প্রজাপতি—কেহই সেই ভীষণ কবল হইতে নিস্তার পাইতেছে না। সকলকেই উদরসাৎ করিতেছে এবং তাহাদের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া বিকট আনন্দে অট্টহাস করিতেছে!

কিন্তু একি! যাহার বুকে ইনি একবার পা দিতেছেন, (যাহার অন্তরে এই মহাশক্তি পূর্ণভাবে জাগিতেছে), সে আর জীব নাই, তৎক্ষণাৎ শিব হইয়া যাইতেছে! তখন পদদলিত পুরুষের দুর্দ্দশা দেখিয়া পার্শ্বস্থ লক্ষীমান্ ব্যক্তিগণ উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "হাঁরে

সর্ব্বনাশিনি! তুই করিলি কি? উহার সব নাশ করিলি? বহুমূল্য বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া কৌপীন পরাইলি, আবার এখন দেখিতেছি তাও নাই,—বাঘছাল! সুন্দর অট্টালিকা ছাড়াইয়া বনবাসী করিলি, তাতেও সাধ মিটিল না, শেষে কিনা নরকঙ্কালাবৃত পূতিগন্ধময় ভীষণ শ্মশানে আনিলি! ছি ছি! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দিলি! তৈল বিনা সুন্দর কেশগুলি ভীষণ জটায় পরিণত হইয়াছে, সুচিক্কণ গাত্র শুষ্ক, রুক্ষ, মলিন হইয়াছে! মণিময় সুবর্ণহারের পরিবর্ত্তে গলে হাড়মালা! আবার সঙ্গীগুলোই বা কেমন! যাহারা সর্ব্বত্র অনাদৃত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, বিতাড়িত, যাহাদিগকে দেখিলেই জীবের ভয় ও অবজ্ঞার উদ্রেক হয়, যাহারা কোন স্থানে কৃপা বা আশ্রয় পায় না—এরূপ কতকগুলা ভূত প্রেত ও বিষধর সর্পকে সর্ব্বদা বুকে পিঠে ও মাথায় তুলিয়া রাখে! আবার সর্ব্বদা নেশা করায় চক্ষু দুটো করমচার ন্যায় লাল ও অর্দ্ধনিমীলিত। কেহ কেহ বলে ঐ নেশার নাম মহাভাব। কাজ কর্ম্ম কিছুই করে না, নেশায় ঝুম হইয়া একটা নিশ্চল অজগরের ন্যায় চুপ্ চাপ্ পড়িয়া থাকে। তবে মাঝে মাঝে এক একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তখন বোধ হয় ক্ষুধা পায়, কারণ উঠিয়াই আহারের চেষ্টা করে। তাও কি একটা ভাল জিনিষ খায়? সবই বিকট। খায় কেবল বিষ! পাছে সাপগুলো অপরকে কামড়াইয়া মারে, তাই প্রথমে তাদের বিষটা খাইয়া ফেলে। তার পর জগতের যেখানে যত বিষ আছে—হিংসাবিষ, দ্বেষবিষ, জিঘাংসাবিষ—কত নাম করিব, সব উদরসাৎ করে। শুনা যায় জীবসমুদ্রমন্থনকালে এই রকমের একটা ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হয়। সকলেই ভয় পাইল, ত্রিলোক যায়। তখন অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই পাগলা সমস্ত বিষটা খাইয়া ফেলিল, তখন থেকে ইহার কণ্ঠটা নীলবর্ণ হইয়া আছে। এমন বিষখোর আর কোথাও দেখি নাই।"

ইহা শুনিয়া কালী একটা বিকট হাস্য করিয়া বলেন "তোদেরও এককালে এই দশা হইবে। জীবের সর্ব্বনাশ করাই আমার কাজ। তোদেরও যা কিছু আছে সবই আমি এক সময়ে খাইব। ভয় পাস্ কেন? সসীমতার নাশ না হইলে অসীমতা মিলে কি?"